কিশোর গ্রন্থাবলী

শ্রীইন্দিরা দেবী

ক্যালকাটা পাবলিশার্স
১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট,
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ-শিল্পী :
শ্রীমৈত্রেয়ী মুখোপাধ্যায়

ছবি :
শ্রীঅরুণ সেন,
শ্রীঅশোক ধর

মুদ্রণ :
শ্রীহরিপদ পাত্র
সত্যনারায়ণ প্রেস,
১, রমাপ্রসাদ রায় লেন,
কলিকাতা ৬

প্রকাশন :
শ্রীপরাণচন্দ্র মণ্ডল
ক্যালকাটা পাবলিশার্স,
১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট,
কলিকাতা-৯

ব্লক তৈরী :
স্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং,
১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট,
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ মুদ্রণ :
মোহন মুদ্রণী,
২, কার্তিক বসু রোড,
কলিকাতা-৯

গ্রন্থন :
ব্যানার্জী এণ্ড কোং,
১০১, বৈঠকখানা রোড,
কলিকাতা-৯

অনির্বাণ ও অনুষ্টুপকে

—মেম

মহালয়া

১৩৬৭

সূচী ঃ

উপন্যাস ঃ

নাটক ঃ

গল্প ঃ

কবিতা ঃ

উপন্যাস

বড়বুদুরের ডাক

এক

জাহাজের পাটাতনের উপর দাঁড়িয়ে জলের দিকে তাকিয়ে সৌম্যর মনে হলো এইবার সে দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে, আবার কতদিন পরে আসবে, কি আসতে পারবে কিনা কিছুই সে বুঝতে পাচ্ছে না। বোধ হয় আর একটু ভেবে এগিয়ে এলে ভাল হতো। কিন্তু তাহলে সে কি কাজে নামতে পারতো, এখনও যদি সে ইচ্ছা করে, জাহাজ থেকে নেমে কোলকাতা ফিরে যেতে পারে ; শেয়ালদা স্টেশনে গিয়ে গাড়ীতে উঠলে ঘণ্টা তিনেক বই তো নয়। তারপর সেই স্টেশনের পথটি ধরে, আঁকাবাঁকা রেখায় যেটি গিয়েছে চৌধুরীদের দীঘির পাশ দিয়ে, আমতলা বাঁদিকে রেখে, বুড়ো শিবের মন্দির ফেলে, ঝুরি-নামা বট গাছটা ছাড়িয়ে বৈকুণ্ঠ কাকার চণ্ডীমণ্ডপ। তারপর আবার বাঁদিকে বেঁকে কিছুটা এগিয়ে গেলে চারদিকের রাস্তাটা যেখানে এক হয়ে গিয়েছে, প্রকাণ্ড একটা চত্বর, যার সবুজ ঘাসে ঢাকা জায়গাটায় ওরা দল বেঁধে খেলতো—সেখানটা ছেড়ে আরো এগিয়ে যদি যাওয়া যায়, চোখে পড়বে পাঠশালার ঘরখানা, তার পাশের রাস্তাটা শুরু হলেই আগে মধু কাকার বাড়ী তারপর প্রবাণ জ্যাঠামশায়, তারপর বলাই ডাক্তারের ছোট ডিসপেন্সারী, আরো একটু এগিয়ে গেলে লাল রং-এর আধভাঙ্গা পুরোনো ছোট বাড়ীটি চোখে পড়বেই। কাঠের রেলিং দেওয়া ছোট দরজাটা দিয়ে ঢুকলেই পরিষ্কার উঠোন আর একপাশে একটি তুলসীমঞ্চ আর তার পাশ দিয়ে মাটি থেকে উঠে গেছে একটি বেলগাছ। বাড়ীর পিছনের ছোট

জায়গাটুকুতে কয়েকটি ফুলগাছ। এই সন্ধ্যাবেলায় কুন্দফুল গাছ আলো করে ফুটে ওঠে। সৌম্যর বুকের ভিতরটা যেন মোচড় দিয়ে উঠলো।

সৌম্য চোখ তুলে তাকালো, জল আর জল। এই জলকে কেন্দ্র করে জাহাজ চলবে, কিছু নেই আর, আর কেবল জল।

সন্ধ্যা নেমেছে, তীরের দিকে তাকালে কেবল আলো। যেন আলোর মালা। সন্ধ্যার ঝিরঝির হাওয়া ভালো লাগে কিন্তু মনকে শান্ত স্থির করতে পাচ্ছে না।

জাহাজের যাত্রীদের সঙ্গীরা সব চলে যাচ্ছেন। সৌম্যর কাছে তো কেউ আসেনি, মায়ের কথা মনে হয়। মার যেন সব তাতেই ভাবনা, সব তাতেই ভয়। ছেলেরা বড় হয়ে উঠলেও মায়েরা ভাবে তেমনি ছোটই আছে বুঝি, খাবার সময় কাছে না থাকলে পেট ভরবে না, সেবার অসুখের সময় বলাই ডাক্তার মাকে সোজা বলে দিলেন: ছেলেকে একটু ছেলের মত হতে দিন বৌঠাকরুণ, অত ভয় ভাবনা কেন? ছেলে তো বেশ গাছে ওঠা, সাঁতার দেওয়া, খেলাধুলো পরিশ্রম সবই পারে—আপনার অত ভাবনা কেন?

পদ্মপিসী দূরে দাঁড়িয়েছিলেন—বলাই ডাক্তারের কথা শুনে বললেন: তুমি কি বুঝবে ডাক্তার—মায়ের মনের কথা, ওর মুখ চেয়ে ওর জীবন।

বলাই ডাক্তার বলেছিলেন: হাঁ, তা হোক, কিন্তু ছেলে তো ছেলের মত হবে।

শান্ত নতমুখী, স্বল্পাবগুণ্ঠনে ঢাকা মার মুখখানি সৌম্যর মনে হলো। আত্মগত ভাবেই সে বলে ফেললো: মা, মাগো মা!

তারপর কখন যে জাহাজ জেটি ছেড়ে ধীরে ধীরে ভাসতে শুরু করছে তা আগে সে বুঝতেও পারেনি। এমন অন্যমনস্ক হয়ে ভাবছিল।

ক্রমশঃ অন্ধকার ঘন হয়ে রাত্রি নামলো। সৌম্য তার নিজের জায়গাটিতে চলে গিয়ে একটা চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লো।

দুই

সৌম্য যেদিন প্রথম পাঠশালায় গেল সেদিন মায়ের মুখখানির কথা সৌম্য বেশ পরিষ্কার মনে করতে পারে। দু'চোখ ভরা জল তবুও মুখে হাসি টেনে এনে তাকে খাইয়ে মুখ মুছিয়ে, জামা পরিয়ে দিয়ে হাতে শ্লেট আর বইখানি

তুলে দিয়ে কপালে একটি চুমু দিয়ে মা বলেছিলেন—ঐ মঙ্গলচণ্ডীর ঘটের কাছে নমো করো সমু, তারপর পাঠশালায় এসো গে।

ঠাকুর প্রণাম করে বাইরে আসতেই পদ্মপিসী হাঁকলেন: কইরে সমু আয়, পাঠশালা যে বসে গেল।

পদ্মপিসীর হাত ধরে সৌম্য সেদিন প্রথম পাঠশালায় গেল।

পাঠশালার ছোট ঘরখানায় আরো গোটা দশ বারো ছেলে চাটাই-এর উপর বসে আছে, কেউ কেউ ধারাপাত খুলে সুর করে পড়তে আরম্ভ করেছে। পায়াভাঙ্গা টুলটার উপর পণ্ডিতমশাই বসেছিলেন। পদ্মপিসী বললেন: নাও গো পণ্ডিতমশাই, নবীনের ছেলেকে ভর্তি করে।

পণ্ডিতমশাই বললেন: কার কথা বলছো?

পদ্মপিসী বললেন: নবীনের ছেলে গো।

পণ্ডিতমশাই বললেন: তা নবীন গেছে কতদিন হলো?

বাধা দিলেন পদ্মপিসী: থাক থাক পণ্ডিতমশাই, ছেলের সামনে আর ওকথা তুলে দরকার নেই। আপনি সমুকে ভর্তি করে নিন। বলরে সমু তোর পুরো নাম।

—আমার নাম সৌম্য রায় আর মার নাম—

বাধা দিলেন পণ্ডিতমশাই, বললেন: তোমার নাম বললেই হবে। আচ্ছা, তুমি ঐখানটায় বোস গে।

তারপর পদ্মপিসী চলে এলেন। ছোট ছোট ছেলেগুলির সঙ্গে সৌম্যর ভাবও হয়ে গেল।

দুপুরের খাওয়াদাওয়া সেরে পদ্মপিসী আবার নিতে এলেন।

বলাই ডাক্তারের ডিস্‌পেনসারীর কাছ থেকেই সৌম্য দেখতে পাচ্ছিল: ছেঁড়া কাপড়ের পর্দাটা ঈষৎ সরিয়ে মা আধখানি মুখ বার করে পথের দিকে তাকিয়ে আছেন। তারপর দরজার কাছে এসে মার অল্প হাসিভরা মুখটি দেখে সৌম্য ঝাঁপিয়ে পড়লো মার কোলে।

পাঠশালার গোণা দিনগুলি দু'বছরে শেষ হয়ে এলো। এর মধ্যে কত ছোট ছোট ঘটনা ঘটেছে যা মনে করে সৌম্য হেসেছে।

স্কুলে যাবার দিনগুলোও কত ভালো ছিল।

পদ্মপিসীর স্নেহ তার সারাটি জীবন ঘিরে আছে। সৌম্যর যখন ছ'বছর বয়স তখন রামায়ণ-মহাভারতের গল্প সবটুকুই জেনে ফেলেছিল পদ্মপিসীর

কাছে। সন্ধ্যা হলেই মা তুলসীতলায় প্রদীপটি জ্বেলে প্রণাম ক'রে তাদের ঘরের দালানটিতে একপাশে ছোট একটা তোলা উনুনে তার খাবার তৈরী করতেন আর সে গরমকালে ছাতে, শীতকালে ঘরের ভিতর মাদুরে শুয়ে পদ্মপিসীর কাছে গল্প শুনতো। সীতাকে রামচন্দ্র বিয়ে করে নিলেন—সেই প্রকাণ্ড ধনুকখানা অনায়াসে মট্ করে ভেঙ্গে ফেললেন—এ ছবি সৌম্যর যেন চোখের সামনে ভেসে উঠতো। কচি ঘাসের মত যার গায়ের রং সেই রামচন্দ্র তার গায়ে আবার শক্তিও তো অনেক, কেমন করে না হলে রাক্ষসরাজ রাবণকে মেরে ফেললে—উঃ, লোকটার সত্যিই খুব শক্তি, যে ধনুক অত লোকে তুলতে পারে না সেখানা বাঁ হাতে তুলে ডান হাতে টঙ্কার দিয়ে দিল। কিন্তু সীতাকে বনে পাঠানোটা খুব খারাপ। আর লক্ষ্মণ ভাই অমনি দাদার কথা শুনে তাকে বনে দিয়ে এলো—বাঘে খেয়ে ফেলতেও তো পারতো, ভাগ্যি না বাল্মিকী এসেছিলেন। পদ্মপিসী সীতার কথা বলতে শুরু করলেই ফোঁস ফোঁস করে নাক টানতেন, পিদিমের আলোতে বেশ দেখা যেতো তাঁর চোখ দু'টো চকচক করছে। মহাভারতের অর্জুন অনেক ভালো। অজ্ঞাতবাস করেছে, বা যেখানে গেছে সকলকে নিয়ে—আর অন্যায় কথা বললেই তাকে মজা দেখিয়ে দিয়েছে। এ লোকটা মোটের উপর ভালো বলা যায়। ওদের মা কুন্তী আমার মায়ের মতই ভালোমানুষ বোধ হয়। রামায়ণের লবকুশ মাকে অমনি চট করে চলে যেতে দিল কি করে? তাদের চোখের সামনে এমন হলো আর কিছু বললে না—সৌম্য মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে ভেবেছিল: নাঃ, মাকে ছাড়া যায় না। পদ্মপিসীর গল্প যখন শেষ হয়ে আসতো তখন সৌম্যর দু'চোখ ভরে ঘুম এসেছে। মা এসে তুলে নিয়ে চোখে মুখে জল দিয়ে বলতেন: চোখ চেয়ে খাও সমু, না হলে সব রাক্ষসের পেটে চলে যাবে, তোমার গায়ে জোর হবে না।

বিষ্টির দিনে কত কষ্ট, সে কথাও মনে পড়ে তার। খাল বিল এক হয়ে বাড়ীর উঠোন অবধি সব জলে ভেসে যেতো। পদ্মপিসী টোকা মাথায় দিয়ে এসে বলতেন: চল সমু, তোকে স্কুলে দিয়ে আসি। আমার কোলে চড়ে যাবি।

—ধ্যাৎ, পদ্মপিসী কি বলে! সমুর এখন কোলে চড়ার বয়স আছে নাকি? স্কুলের কোনো ছেলে যদি দেখে ফেলে—সে লজ্জা রাখার জায়গা নেই তাহলে। বিষ্টি কমে যদি যাবো। ভিজে কাঠে রাঁধতে না পেরে ফুঁ

দিয়ে দিয়ে ধোঁয়ায় মার চোখ দুটো লাল হয়ে উঠেছে, কখন বৃষ্টি ছেড়ে গিয়ে আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেছে। স্কুল যাবার আর কোনো অসুবিধা নেই।

খেয়ে বই-খাতা নিয়ে স্কুলের পথে পা বাড়াতেই আরো ছেলেদের সঙ্গে দেখা হয়। পদ্মপিসীর দরজা দিয়ে যেতে হয়, ঠিক নজর আছে তাঁর—বলে ওঠেন : কিরে সমু যাবো নাকি?

সঙ্গে সঙ্গে রত্নাও মুখ বাড়ায়—পদ্মপিসীর ভাইঝি রত্না জানালার ফাঁক দিয়ে মুখখানা একটু বার করে সে চেঁচিয়ে বলে ওঠে :

আয় বিষ্টি ঝেঁপে, ধান দেবো মেপে—

সমুদার ইস্কুল যাওয়া হবে না।

সৌম্য জোরে পা চালায় আর জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে রত্না চেঁচায় : ফিরবার সময় আমার জন্য একটা কাঁচা পেয়ারা—বুঝলে, মনে থাকে যেন।

তিন

আগে এ চত্বরে কোনো স্কুল ছিল না। তাদের বাড়ী থেকে অনেকখানি পথ পার হয়ে সেই ভার্গবী নদী, যেটা একফালি রূপোর পাতের মত পড়ে আছে, পায়ের কাপড় দু'হাতে ধরে সেটা পার হয়ে ওপারে গেলে তবে স্কুলে যাওয়া যেতো। বর্ষাকালে কি মুস্কিলই না ছিল, এ গ্রামের জমিদার বহুদিন শহরবাসী হয়েছেন। একবার তাঁর বড় ছেলের গ্রামে আসবার শখ হলো আর এসে উঠলেন বসতবাড়ীতে। মস্ত ঠাকুর-দালানে পায়রা-পরিবার নির্বিঘ্নে বাস করছে। বৈঠকখানার প্রকাণ্ড হলঘরে মাকড়সা পরম নিশ্চিন্তে জাল বুনে চলেছে। খাজাঞ্চীখানার ঘরের দরজা-জানালাগুলোতে ভাঙন ধরেছে। বড় বড় কার্ণিশের গায়ে ছোট ছোট অশ্বত্থ গাছের চারা দেখা দিয়েছে। ঠাকুর-দালান থেকে নেমে এসে যে প্রকাণ্ড উঠোন—এখানে দোলমঞ্চ রাসমঞ্চ সব ছিল—সে সব কাঠের মঞ্চ ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে গেছে।

জমিদার-নন্দন বেড়াতে এসে প্রাসাদের এই অবস্থা দেখলেন। প্রাসাদের বহির্বাটি ও বিরাট প্রাঙ্গণ, কর্মচারীদের বাসের বদ্ধ ঘরগুলি সব সংস্কার করে পিতামহের নামে এক হাইস্কুল করে দিলেন। ছেলেদের শরীর চর্চার জন্য

এক ব্যায়ামাগার ও প্রায় মজে-আসা মজা পুকুরকে সংস্কার করে স্যুইমিংপুল তৈরী করলেন। একটা লাইব্রেরীও তাঁদের বৈঠকখানার ঘরে স্থাপিত হলো।

বারোমাস নদী পার হয়ে স্কুলে যাওয়ার দুঃখ-কষ্টের অবসান হলো।

চার

একদিন স্কুলে যাবার কথা খুব বেশী করে মনে পড়ে।

একটু দেরীই হয়ে গিয়েছিল সেদিন, বই খাতা নিয়ে একটু দ্রুতই চলছিল। কিন্তু পদ্মপিসীদের বাড়ীর জানালায় রত্না আছে কিনা সেটা দূর থেকে লক্ষ্য করতে গিয়ে এমন হোঁচট খেয়ে পড়লো, যে পা ছড়ে, কেটে, একাকার হলো। পদ্মপিসী বেরিয়ে এলেন : কি হয়েছে রে?

—সমু পড়ে গেছে, পা কেটে গেছে, খুব লেগেছে—দীপু নীরুর দল একসঙ্গে বলে উঠলো।

—য়্যাঁ, কি করে পড়লো?

—হ্যাঁ, আয় বাবা তোরা, এই বাইরের ঘরের তক্তপোষটায় শুইয়ে দে। রক্ত কি খুব বেশী পড়ছে? দাঁড়া আমি চারটি গাঁদার পাতা আনি। ও বৌ, ও রত্নার মা, হেঁসেল রেখে শীগ্গির একটু চিনি চুণ নিয়ে এসো তো! আর রত্নাই বা গেল কোথায়? রত্না! ও রত্না!

—যাই পিসীমা! ছোট চুল দুলিয়ে আধময়লা রং-ওঠা একটা ফ্রক-পরা রত্না এসে দাঁড়িয়ে সৌম্যকে দেখে বলতে শুরু করলো :

—ওমা কি হয়েছে সমুদা'র? শুয়ে পড়েছো যে?

নীরু বলে উঠলো : চট করে একটু চিনি আর চুণ নিয়ে এসো!

রত্নার চিনি-চুণ, পদ্মপিসীর গাঁদার পাতা, সব এসে পড়লো একই সঙ্গে। যথারীতি ব্যবস্থাও হলো।

খুব বেশী লাগেনি। রক্ত পড়েছে খানিকটা। পদ্মপিসী বললেন, কি রে যাবো নাকি একবার বলাইএর কাছে?

সৌম্য জোরে ঘাড় নাড়লো : না, না, পিসীমা না, কিছু করতে হবে না। তারপর সহপাঠীদের দিকে তাকিয়ে বললে : তোরা স্কুলে চলে যা, আমি একটু পরে যাচ্ছি!

পদ্মপিসী বলেন : এখনই স্কুল যাবি কি? না, না তোমায় যা। সমুর আজ যাওয়া হবে না।

বন্ধুর দল ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

পদ্মপিসী বললেন : এখন চুপ করে শুয়ে থাক।

পদ্মপিসী কাজ সারতে গেলেন। বেলা প্রায় তিনটে পর্যন্ত সৌম্য সেই চৌকির উপর শুয়েই ছিল। কিছুক্ষণ চুপ করে, কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে আর কিছুক্ষণ রত্নার সঙ্গে গল্প করে সময়টা যেন ফুরিয়ে গেল।

তারপর তিনটের সময় একবাটি গরম দুধ আর দু'টো নারকেল নাড়ু দিয়ে পদ্মপিসী বললেন : চল সমু, তোকে বাড়ী রেখে আসি।

—আমি তো ভালই আছি পিসীমা।

—তা হোক বাবা, চল, আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাই। ওরে রতন, তোর সমুদা'র বই-খাতা নিয়ে চল রেখে আসবি।

রত্না সবগুলি বইপত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল।

পিছনে স্কুলফেরত দীপুরা আসছিল—ওদের দেখে দৌড়ে কাছে এলো : কেমন আছিস সমু, সেরে গেছে সব?

সৌম্য বলে : ব্যথা একটু আছে।

মাস্টারমশাই তোর কথা জিজ্ঞাসা করছিলেন।

একটু দূর থেকেই বাড়ীটা দেখা যায়। মা জানালার কাছে এসে পথের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

বাড়ী ঢুকে পদ্মপিসী বললেন : আজ ইস্কুল যাবার সময় সমু বাড়ীর সামনে পড়ে গিছল বৌ, তাই আমি ইস্কুল যেতে দিইনি। কেটেকুটেও গিয়েছিল একটু, এখন ভাল আছে। সারা দুপুর রতন গল্প করেছে। তুই ভাববি বলে আমি কিছু জানাইনি।

এক মুহূর্তেই মার মুখের হাসিটা মিলিয়ে গিয়ে উদ্বেগের ছায়া নামলো। সৌম্য বললে : সব সেরে গেছে মা, একটু লেগেছিল। পিসীমার তো বড্ড ভয় তাই আমায় যেতে দেননি। আমি বেশ ভাল আছি।

পাঁচ

পরের দিন স্কুলে যেতে একটু কষ্টও হয়েছিল, সৌম্য বেশ মনে করতে পারে। আগের দিন সারারাত মা জেগে থেকে সৌম্যর গায়ে হাত বুলিয়েছেন, ব্যথার জায়গায় তাপ দিয়ে দিয়েছেন।

স্কুলে যাবার পথে আজ রত্না জানালায় বসে নেই। পদ্মপিসীর হাত ধরে রীতিমত বাইরে এসে দাঁড়িয়ে আছে। সৌম্যকে দেখে এক মুখ হেসে বললে: ভালো হয়ে গেছে সমুদা।

পিসীমা হেসে বলেছিলেন: দেখে শুনে পথ চলো। পাড়াগাঁয় বর্ষার রাস্তা; খুব সাবধানে চলতে হয়।

সহপাঠীদের দলও এসে পড়তেই সকলে মিলে চলতে শুরু করলো।

একদিন স্কুল কামাই হলে মনে হয় কতদিন বুঝি আসা হয়নি—কত পড়া হয়তো হয়ে গেল।

বেশ দূর থেকেই স্কুলবাড়ীর কলরব শোনা যায়—ছেলেরা উল্লাসে খেলায় মেতেছে। সৌম্যর আজ যেন বেশী করে মনে পড়লো 'প্রতাপনারায়ণ স্কুলের' প্রতিষ্ঠাতা সেই জমিদার-নন্দনকে। যদি তিনি এই স্কুলটি গ্রামের ছেলেদের জন্য প্রতিষ্ঠা না করতেন তাহলে কত অসুবিধাই না হতো! এই রকম ব্যথা-পা নিয়ে নদী পার হয়ে স্কুল যাবার কথা সৌম্য ভাবতেই পারতো না। আবার মনে হলো মেয়েদের জন্য একটা স্কুলও তো করতে পারতেন—রত্নার কত পড়বার শখ, রত্নার মত আরো হয়তো কত মেয়ের মনেই এমনি আশা লুকিয়ে আছে।

কালু বললে: তোর কি খুব কষ্ট হচ্ছে সমু, চুপ করে পথ চলছিস্!

স্কুলের দরজার কাছে পৌছতেই হারাধন এসে বললে: কি হয়েছে তোর? নাঃ, তুই নিতান্তই আলুরদম ছেলে। তারপর গলার আওয়াজ নামিয়ে বললে: তোর জন্য আজ দু'খানা বিস্কুট এনেছি সমু, সেদিন পেন্‌সিল নিয়ে যা কাণ্ড বেধেছিল আর তুই সেই গোলমাল থেকে আমায় বাঁচালি—তাই সেকথা আমি ভুলিনি। টিফিনের সময় আমার কাছে আসিস কিন্তু।

সৌম্যর প্রসন্ন মনটা আবার যেন ধাক্কা খেল। সৌম্য বললে: বিস্কুট আমি চাই না খেতে। কেন তুমি না বলে পেন্‌সিল নিয়েছিলে? আমি ওদের কাছে মিথ্যাবাদী হয়ে গেলাম!

হারাধন সৌম্যর দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বললে: আচ্ছা।

ক্লাসে ঢুকে সৌম্য দেখলো অনেক দূরের বেঞ্চিতে গিয়ে হারাধন বসে আছে।

টিফিনের সময়ও সৌম্য হারাধনকে দেখতে পেলো না। খেলার মাঠে, ম্যাচ স্থুরু হবার আগে একটা ছেলে এসে সৌম্যর হাতে একটা কাগজ দিয়ে গেল। সে খুলে দেখলে হারাধন লিখেছে, তুমি আমায় যেরকম অপমান করেছো আমিও তার শোধ নেবো।

চিঠিটা পড়ে সৌম্যর কিছুক্ষণ ভাবান্তর হয়েছিল। কত তুচ্ছ জিনিসকে নিয়ে হারু ফেনিয়ে তুলেছে অথচ বিশ্রী অভ্যাসটা ত্যাগ করতে পারছে না বা তাকেও বলতে পারছে না তার ভুলের কথা।

ম্যাচ শেষ হলো। সৌম্যদের টিমই জিতলো। সৌম্য ভাবলো বাড়ী যাবার সময় হারুকে ডেকে সামান্য ব্যাপার মিটিয়ে ফেলবে কিন্তু তাকে কোথাও দেখতে পেলো না।

ওর গম্ভীর মুখ দেখে নীরু বললে: তুই খেলতে পাস্‌নি বলে বুঝি তোর মন খারাপ হয়েছে, অমন করে আছিস্‌ কেন ?

—না, না, মন খারাপ হবে কেন ?

পদ্মপিসীর বাড়ীর কাছে আসতেই রত্না চেঁচিয়ে ডাকলো: সমুদা, নীরুদা, দীপুদা—যারা যারা আছ সব্বাই বাড়ীর ভিতরের উঠোনে এসো—হরির-লুট হচ্ছে।

পদ্মপিসীও সকলকে ডাকলেন। উঠোনের মাঝে তুলসীমঞ্চ। প্রদীপ জ্বলছে। একটা ঘটিতে গঙ্গাজল আর কাঁসার বড় বাটিতে বাতাসা আর নারকেল নাড়ু। পূজো শেষ হয়ে গেছে সবাইকে হাত ধুয়ে প্রসাদ নিয়ে বাড়ী ফিরতে হোলো। একটা কচুপাতায় মুড়ে সামান্য প্রসাদ সৌম্যর হাতে দিয়ে রত্না বললে: কাকিমাকে দিও সমুদা।

ছয়

ক্লাস নাইন-এ উঠে সৌম্য নিজেকে বেশ বড় মনে করতে লাগলো।

স্কুলে তার সবচেয়ে ভালো লাগতো নির্মলবাবুকে—ইতিহাসের শিক্ষক। সৌম্যকে তিনিও যেন বেশী স্নেহ করতেন—নির্মলবাবু এই গ্রামে শিক্ষকতার কাজ নিয়ে এলেন এই তো বছর চার আগে। তখন সৌম্য ক্লাস সিক্স-এ

পড়ছে। ওঁর অত্যন্ত সহজ করে পড়ানো সৌম্যর খুব ভালো লাগতো। বলতেন: শরীর যাতে ভাল হয়, ছোটবেলা থেকে সেজন্য ব্যায়াম করতে হয়—

কতদিন পরীক্ষার আগে খুব ভোরে উঠে যখন সে পড়া মুখস্থ করতে বসেছে, তখনও হয়তো ভালো করে ফর্সা হয়নি—নির্মলবাবুকে প্রাতর্ভ্রমণ সেরে ফিরতে দেখেছে। তার ইচ্ছা হয়েছে 'স্যার' বলে জোরে ডেকে ওঠে—কিন্তু হয়তো কি ভাববেন মনে করে নিরস্ত হয়েছে—অথচ এখানে যে বাড়ীতে তিনি থাকেন সেখানে আর তো কেউ থাকে না! মা-ও নেই, স্ত্রী-ও নেই—একেবারে একলা। সব কাজ তিনি নিজে হাতে করেন। কতদিন সৌম্য ওঁর বাড়ী গেছে। বারান্দায় একটা আরাম চেয়ারে বসে বই পড়ছেন, বলেছেন: এসো সৌম্য, বসো।

নির্মলবাবু বলেন: পড়ো, সৌম্য, পড়ো, স্কুলের গণ্ডীর বাইরে এসে পড়ো, ভাবতে শেখো।

ক্লাস টেন-এ উঠে তার মনে হলো এবার সে অনেক বড় হয়ে গেছে। জানবার আগ্রহ বুঝবার আগ্রহে শিক্ষাগুরু নির্মলবাবুর কাছে যায়। দেশ-বিদেশের কত কথা কত বিচিত্র কাহিনী তিনি যা বলতেন যেন মনে হতো সিনেমার ছবির মত একটার পর একটা চোখের সামনে ভেসে উঠছে। চোখের সামনে ভেসে উঠতো—সেই বালির সমুদ্র—যতদূর চোখ যায় বালি আর বালি··· জনমানবের কোনো চিহ্ন নেই। সেই বালির সমুদ্র ধরে এগিয়ে চলতে চলতে হয়তো বা চোখে পড়বে কতকগুলো তাঁবু. তার ফাঁকে ফাঁকে দূরে দূরে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটা গাছ! ওরা যেন নেহাতই বেমানান এখানে। অস্তমান সূর্যের লাল রশ্মি সেই খেজুর গাছের পাতাগুলোর উপর পড়ছে। আরো দূরে দেখা যাবে উটের সারি, তাদের পিঠে রকমারি জিনিসের বোঝা। তারপর সূর্য অস্ত গেল—আর সন্ধ্যা হবার সঙ্গে সঙ্গে মরুভূমির বুকে এলোমেলো বাতাস বইতে থাকে, ধুলোর ঝড় ওঠে···আর এগোনো সম্ভব হয় না। যাত্রীদের নেমে যেতে হয়—তাঁবু ফেলে বিশ্রাম করতে হয়। তারপর তাঁবুর ভিতর চারিদিক ঘিরে জমে ওঠে বালির পাহাড়। সকালবেলা তাঁবু উঠিয়ে যাত্রীরা চলে গেল, পিছনে কিছুই পড়ে রইল না—সেই অন্তহীন বালির সমুদ্রে কোথাও এতটুকু দাগ পড়ে থাকলো না। আবার দুপুরে যখন আগুনের হল্কা বইতে থাকে তখন যাত্রীদের চলবার শক্তি কমে

আসে—উটেরা বেশ সারি সারি চলতে থাকে⋯কিন্তু যাত্রীরা তখন চোখ খুলে চলতেও পারে না—সিল্কের কাপড় চোখে মুখে বেঁধে চলেছে—এগুলো যেন সৌম্য স্পষ্ট দেখতে পায়। আবার তার দৃষ্টি চলে যায় লোহিত সাগর পার হয়ে সেই নীল নদের তীরে। সেই কত যুগ আগে মিশরের রাজাদের সমাধি-মন্দির ভেসে ওঠে চোখের সামনে। আবার কখন তার দৃষ্টি চলে যায় হিমালয় পার হয়ে বরফের দেশ তিব্বতে। কখনও তার মনে হয় যে চলেছে মানস সরোবর অভিযানে। এমনি কত বিচিত্র ছবি খেলা করে তার চোখের সামনে। তাদের এই গ্রাম। তুলসী-মঞ্চ আর ঝুমকোলতা-ঘেরা প্রাঙ্গণ ঝাপসা হয়ে যায়।

নির্মলবাবু ছাত্রদের সকলকেই সস্নেহে আহ্বান জানাতেন। সকলকেই গল্পের মধ্য দিয়ে কত উপদেশ দিতেন সকলকে স্নেহ করতেন; তাঁর যে সব বইপত্র আছে, তাতে সকলে হাত দিয়েছে,—তিনি কিছুই বলেননি। বারণও করেননি—কিন্তু কোণের দিকে ঐ যে কাচের আলমারিটা—ওটায় কিছুতেই তিনি হাত দিতে দেন না কাউকে, নিজেও সচরাচর সেটা খোলেন না। তার মধ্যে কি আছে সেটা দেখবার কৌতূহল সৌম্যর অনেক দিন হয়েছে। যা দেখেছে তা হলো নানা ধাতুতে তৈরী ভাঙ্গা-চোরা কিম্ভূতকিমাকার কতকগুলি পাত্র; কতকগুলো রং-ওঠা মাটীর খেলনা। ময়লা কতকগুলো চাকতি আর জীর্ণ হয়ে যাওয়া তালপাতার উপর লেখা পুঁথি লাল শালু দিয়ে ঢাকা। এগুলো কেন এত যত্ন করে রাখা হয়েছে এবং কাউকে হাত না দিতে দেওয়ার কারণ সৌম্য কিছুতেই বুঝতে পারতো না। তার দামী হাতঘড়ি, কলম, কত জিনিস চারদিকে ছড়ানো—কিছুই তিনি সাবধান করেন না। এমন কি গতবার প্রবেশিকা পরীক্ষার সময় মোহনদা যখন কোলকাতা গেল, নির্মলবাবু ইচ্ছা করেই তার সুবিধার জন্য ঘড়িটা দিয়ে দিলেন।

একদিনের কথা সৌম্যর মনে পড়ে, আলমারি ঝাড়তে গিয়ে কি একটা ঠক করে পড়ে গেল। ভাঙ্গাচোরা কি বিশ্রী জিনিস, তার দামই বা কি! কিন্তু নির্মলবাবু এমন আঁতকে উঠলেন যেন তাঁর কত বড় সর্বনাশ হয়ে গেছে। নীচু হয়ে সেই টুকরোগুলোকে জোড়া লাগাবার বৃথা চেষ্টা অনেকক্ষণ ধরে করলেন। কিন্তু সে টুকরোগুলো যখন জোড়া লাগলো না তখন খুব সন্তর্পণে আলমারিতে উঠিয়ে রাখলেন।

মাঝে মাঝে বিলাতী টিকিট-মারা বড় বড় খাম তাঁর কাছে আসতো। ইংরাজীতে পাতার পর পাতা কি সবলেখা যেদিন সে সব কাগজ আসতো নির্মলবাবু সব কাজ ছেড়ে ঐ নিয়ে বসে থাকতেন। ওতে কি যে এমন লেখা থাকতে পারে যার জন্য সব কাজ ভুলে যেতে হবে? অন্য মাস্টারমশাইরা তো এ ধরণের কাগজ পড়েন না।

একদিন অনেক সাহস মনে এনে সৌম নির্মলবাবুকে জিজ্ঞাসা করে ফেললে: আলমারির ঐ জিনিসগুলো কি? ওগুলো অত যত্নে আর সাবধানে আপনি কেন রাখেন?

নির্মলবাবু একটু হাসলেন। তারপর বললেন: কেন সাবধানে রাখি? এসব কথার উত্তর দিতে গেলে অনেক কথা তোমায় বলতে হবে—আজ তো সময় নেই। কাল রবিবার স্কুল বন্ধ, দুপুরের দিকে আমার কাছে এসো। আমি তোমার এই প্রশ্নের জবাব দেবো।

সাত

আজ রবিবার। সে নির্মলবাবুর বাড়ীর দরজার কাছে উপস্থিত হয়েছে, নির্মলবাবু ডাকলেন: এসো সৌম্য।

নির্মলবাবু বললেন: কাল তোমায় বলেছিলুম যে গল্প বলবো, তা আজ শুনবে।

নির্মলবাবু সুরু করলেন: যখন তোমাদের মত ছোট ছিলাম স্কুলে ইতিহাস পড়তে খুব ভালো লাগতো—ক্রমশঃ স্কুল থেকে কলেজে এসেও সেই ইতিহাস আগ্রহের সঙ্গে পড়তাম। আমাদের ইতিহাস পড়াতেন প্রফেসর রায়—পড়াতেন চমৎকার, কলেজের পরও কত সময় তাঁর কাছে গেছি, আমার ইতিহাসের প্রতি অনুরাগ দেখে তিনি খুশি হয়েছেন। ক্রমশঃ এই ইতিহাসের নেশা আমায় পেয়ে বসলো। কেবল বই পড়ে আমার তৃপ্তি হতো না—মনে হতো কবে এইসব স্থান দেখবার সৌভাগ্য আমার হবে। তারপর সত্যি তা যখন ঘটলো তখন আমার যে কী আনন্দ তা তোমায় কি করে বোঝাব! সারনাথ, বারাণসী, নালন্দা, রাজগীর, বুদ্ধগয়া, তক্ষশীলা, হরপ্পা, মহেঞ্জোদড়ো এই সব নিজের চোখে দেখলুম। চারিদিকে বিরাট অঞ্চল জুড়ে ধ্বংস-স্তূপ, উঁচু নীচু অসংখ্য ঢিবি, ধ্বসে পড়া দেয়াল, ভাঙ্গাচোরা মন্দির, ইটের স্তূপ—

এ সবগুলো চোখের সামনে ছড়িয়ে আছে, আমার মন এ সব অতিক্রম করে সেই হারিয়ে যাওয়া যুগে ফিরে যেতো। সারনাথে ভগবান বুদ্ধ পঞ্চভিক্ষুর কাছে তাঁর ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করছেন—তাঁর দীর্ঘ গৌরকান্তি, জ্যোতিষ্মান মূর্তি, তাঁর মুখে অমৃতময় বাণী, চোখে করুণাধারা; আবার মানশ্চক্ষে কখনও প্রত্যক্ষ করতাম নালন্দার সেই মহাবিহার। পৃথিবীর দেশ-দেশান্তর থেকে আগত কত শিক্ষার্থীর আলোচনায় মুখরিত হয়ে উঠতো সেই মহাবিদ্যালয়, দশ সহস্র শিক্ষার্থী যেখানে নানা বিদ্যায় শিক্ষালাভ করছে। কৃতবিদ্য সব অধ্যাপকেরা বক্তৃতামঞ্চ থেকে কত সব দুরূহ বিষয় নিয়ে আলোচনা করছেন। বড় বড় বিরাট চারতলা সমান উঁচু গম্বুজ, তার জানালা দিয়ে আকাশের মেঘের খেলা ও রাতের তারা দেখা যায়, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি নিয়ে বিজ্ঞানীরা গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধি নিয়ে গবেষণা করছেন। মন চলে যেতো সেই দিনে, যে দিন চীন-পরিব্রাজক হিউ-য়েন-সাঙ এই মহাবিদ্যায়তনে বিদ্যার্থী হয়ে প্রবেশ করেছিলেন। সেদিন তাঁকে অভ্যর্থনা জানানোর কি বিপুল আয়োজন। মনে পড়ে মহাস্থবির শীলভদ্রের কথা, বয়সের ভারে শরীর নত হয়ে পড়েছে কিন্তু তা সত্ত্বেও অধ্যয়নের কী গভীর অনুরাগ। এই রকম আরো কত কি ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠতো তা কি বলবো! যখন যেখানে গেছি সেখান থেকে সেই পুরাতন যুগের স্মারক চিহ্ন কিছু সংগ্রহ করবার চেষ্টা করেছি। খুব দামী কিছু পাইনি কিন্তু যা পেয়েছি আমার কাছে তার দাম অনেক। এইগুলোর দিকে যখন তাকিয়ে থাকি তখন মনে হয় এরা অতীতের ভগ্ন স্তূপ থেকে উঠে এসে আমার সঙ্গে কথা বলছে—কত ঘটনার সাক্ষী হয়ে আছে। কিন্তু সে যাক—তোমাকে আমার ব্যক্তিগত জীবনের কয়েকটি কথা বলি—

আমার ঠাকুর্দা সেকেলে লোক হলেও রক্ষণশীল ছিলেন না। ছোটবেলা থেকেই জেদী আর একগুঁয়ে বলে তাঁর দুর্নাম ছিল। সামান্য একটা কি কারণে তাঁর বাবার সঙ্গে রাগারাগি করে বাড়ী থেকে চলে যান এবং পরে জানা যায় তিনি ইংরেজ সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করেছেন। এ ব্যাপারটা তাঁর পরিবারের কাছে এক অভাবনীয় ব্যাপার। বাংলা দেশের মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে—জমিজমা দেখবে বা চাকরী নিয়ে কোনও রকমে জীবিকা নির্বাহ করবে। এর বেশী তাঁরা আর কিছু ভাবতে পারতেন না। কিন্তু ঠাকুর্দা ছিলেন অন্য ধাতুতে তৈরী। সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করার পর কদাচিৎ তাঁর কাছ থেকে চিঠি পাওয়া যেত।

হঠাৎ একদিন খবর পাওয়া গেল যে সামরিক বিভাগের আদেশ অনুসারে তিনি আফগানিস্থানের যুদ্ধে যোগ দিতে বাধ্য হয়েছেন। তখন ইংরাজের সঙ্গে আফগানদের লড়াই চলছিল। সেই লড়াইএর খবর দেশে বড় একটা আসতো না। তাঁর সম্বন্ধে সকলের দুর্ভাবনার অন্ত ছিল না। হঠাৎ একদিন সামরিক বিভাগের গাড়ী এসে গ্রামে ঢুকলো। গাড়ী এসে আমাদের বাড়ীর সামনে দাঁড়ালো। গাড়ী থেকে বেরিয়ে এলেন ঠাকুর্দা কিন্তু তাঁর চেহারা বদলে গেছে। নিয়মমত ও স্বাস্থ্যকর জায়গায় থাকার জন্য তাঁর চেহারার খুব পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু তাঁর বাঁ হাতটি নেই। পরে তাঁর কাছ থেকে জানা গেল যে কাবুলের যুদ্ধে তিনি শত্রুর গোলায় আহত হয়ে হাসপাতাল পড়েছিলেন —অনেকদিন তাঁর জ্ঞান ছিল না। তারপর যখন জ্ঞান হলো তখন দেখা গেল যে তাঁর বাঁ হাতখানা নেই। হাসপাতালে থেকে যখন তাঁর ছাড় হলো তখন সামরিক কর্তৃপক্ষ তাঁকে দেশে পাঠিয়ে দিলেন। অত দুঃখেও সকলে এই ভেবে সান্ত্বনা পেলেন যে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসেছে।

কিন্তু ঠাকুর্দার মোটেই ঘরে মন বসলো না। কয়েক মাস বিশ্রাম করেই আবার তিনি বেরিয়ে পড়লেন। ক্রমাগত কয়েক মাস ধরে তাঁর কোনও খবরই পাওয়া যেতো না। হঠাৎ একদিন বলা নেই কওয়া নেই ঠাকুর্দা এসে হাজির। বিশ্রী উস্কো খুস্কো চেহারা। এতদিন কোথায় কি ভাবে কাটালেন তা জানতে চাইলে চুপচাপ থাকতেন। আমি তখন ছোট, আমি কিছুই বুঝতাম না, কেবল ঠাকুর্দাকে আমার খুব ভাল লাগতো। আমার একমাত্র খেলবার বা গল্প শুনবার জায়গা ছিল ঐ ঠাকুর্দার ঘর।

রোজ সন্ধ্যার সময় আমাদের দু'জনের গল্প জমে উঠতো। ঠাকুর্দা বক্তা আর আমি শ্রোতা। তাঁর সব কথা আমি বুঝতে পারতাম না; কিন্তু তাঁর কথা শুনতে খুব ভাল লাগতো। কত দেশ তিনি ঘুরেছেন—কত অচেনা অজানা দুর্ভেদ্য জায়গায় তিনি গেছেন—সেই সব কথা তিনি আমাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বলে যেতেন, আমি অবাক বিস্ময়ে শুনতাম। তিনি এমন সব দেশের কথা বলতেন যার কথা ভূগোলের কোন বইতে খুঁজে পাইনি। একবার তিনি আমাকে ডেকে বললেন: নিমু, কাউকে কিছু বলো না, আমার এখানে থাকতে আর ভালো লাগছে না, আমাকে আজকালের মধ্যে আবার বেরিয়ে পড়তে হবে। আবার ফিরে আসবো কিনা জানি না। তারপর পকেট থেকে একটা রূপোর চাকতি বার করে আমায় দিয়ে বললেন: নিমু, এটা তোমায়

দিয়ে যাচ্ছ, 'কাবুল যুদ্ধে' আমার সাহস আর বীরত্বের জন্যে জঙ্গীলাট আমাকে এটি পুরস্কার দিয়েছিলেন।

আমি মেডেলটা হাতে নিয়ে বললাম: ঠাকুর্দা, তুমি আর ফিরে আসবে না?

তিনি বললেন: কি জানি ভাই কি হবে, এবার যাবো আমি দূরের পাল্লায়।

পরের দিন সকালে উঠে ঠাকুর্দাকে আর দেখতে পেলাম না। এরকম ঘটনা বাড়ীর লোকের কাছে নতুন নয়, তাই এ নিয়ে কেউ মাথা ঘামালো না।

কয়েক বছর পরে খবর পাওয়া গেল। আমি তখন কলেজে পড়ি। পূজোর ছুটিতে বাড়ী এসেছি। একদিন নীচের ঘরে বসে আছি, একজন অপরিচিত লোক ঘরে ঢুকলো। তার চেহারা আর পোষাক দেখে মনে হলো বিদেশী। ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথায় আমায় জিজ্ঞেস করলো: আপনার নাম নির্মলবাবু?

আমি মাথা নেড়ে হাঁ বলতেই—সে তার আলখাল্লার মত লম্বা পোষাকে হাত ঢুকিয়ে তার ভিতর থেকে একটা কাগজের বাণ্ডিল বার করে আমার হাতে দিয়ে বললে: এটা আপনার। একথা বলেই লোকটা ঘর ছেড়ে নেমে গেল।

আমি কাগজের বাণ্ডিল খুলে যখন ঠাকুর্দার মত হাতের লেখা দেখলাম তখন লোকটাকে ডাকতে গেলাম কিন্তু সে তখন দৃষ্টির বাইরে।

তারপর বাণ্ডিলটা খুলে দেখলাম ঠাকুর্দার হাতে লেখা তাঁর ডায়েরী। আমি দরজা বন্ধ করে ডায়েরী নিয়ে পড়তে বসলুম।

নির্মলবাবু মুখটা মুছে নিয়ে বললেন: ডায়েরীতে কি লেখা ছিল তা আবার পরে বলবো—তোমার কাল পরীক্ষা আছে না? যাও, যাও, ওঠো—আজ আর নয়।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও সৌম্যকে উঠতে হলো। নির্মলবাবুর আদেশও যে না মেনে উপায় নেই, সত্যিই কাল পরীক্ষা।

চাঁদের আলোয় সারা পথ ভরে গেছে। সেই পথ বেয়ে নির্মলবাবুর কথা ভাবতে ভাবতেই সৌম্য বাড়ী এসে পৌঁছল।

আট

পরীক্ষার মধ্য দিয়ে ক'দিন কাটলো। পরীক্ষা শেষ হলো, সৌম্য অফিস ঘরে গেল—শুনলো আজ সাতদিন তিনি স্কুলে আসেননি, শরীর খুব অসুস্থ। স্কুল ছুটি হওয়ামাত্র সৌম্য নির্মলবাবুর বাড়ী গিয়ে পৌঁছল। বাড়ীতে কেউ নেই। শোবার ঘরের বিছানায় নির্মলবাবু শুয়ে, ধারে কাছে কাউকে দেখা গেল না। দু'পা এগিয়ে গিয়ে ডাকলো: স্যার!

সাড়া এলো: এসো।

আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকে সৌম্য বললে: কী হয়েছে আপনার?

নির্মলবাবু বললেন: জ্বর। দু'দিন কোন হুঁশ ছিল না। বেহারী বুদ্ধি করে তোমাদের পাড়া থেকে বলাইবাবুকে ডেকে নিয়ে আসে। তিনি ওষুধপত্তর দিয়েছেন, আমি খুব ভাল বুঝছি না। শরীরে যেন কোনো শক্তি নেই, বাঁদিকটা যেন অসাড় হয়ে আসছে—

সেদিন থেকে সৌম্যর ব্যবস্থায় স্কুলের সব ছেলেরা পালা করে এসে তাঁর দেখাশোনা সেবা-যত্ন করতে লাগলো। মাস্টারমশাইরাও আসতে লাগলেন। কয়েকদিন পরে বলাই ডাক্তারের কথামত জেলার সদর থেকে বড় ডাক্তার আনা হলো। তিনি দেখে শুনে বললেন: জ্বরটা সারানো যাবে কিন্তু বাঁদিকটা হয়তো অবশ হয়ে যেতে পারে।

হলোও তাই। জ্বর একদিন ছাড়লো কিন্তু যাবার সময় তাঁর বাঁ হাত আর পায়ের শক্তি নিয়ে গেল।

এর কয়দিন পরেই কোলকাতা থেকে এক ভদ্রলোক এলেন। তিনি নির্মলবাবুর আত্মীয় এবং দু' একদিনের মধ্যেই সব কিছু উঠিয়ে নির্মলবাবুকে নিয়ে রওনা হয়ে গেলেন।

ওরা চলে যাওয়ার দিনটা সৌম্য ভুলতে পারে না।

স্টেশনে যখন গাড়ী ছাড়লো তিনি করুণ চোখে একবার স্কুলের দলটার দিকে তাকালেন, তারপর চোখ ফিরিয়ে সৌম্যর দিকে তাকিয়ে নীরব ভাষায় আশীর্বাদ জানালেন। যতদূর দেখা যায় দু'জনে দু'জনের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

নয়

সৌম্য প্রথম বিভাগে বৃত্তি নিয়ে পাশ করেছে। সারা গ্রামে হৈ হৈ পড়ে গেছে। প্রধান শিক্ষকমশাই সৌম্যকে ডেকে বললেন : তুমি শুধু স্কুলের নয়, গ্রামের মুখ উজ্জ্বল করেছ।

সৌম্য সকল শিক্ষকদের প্রণাম করলো, তার প্রথমেই মনে পড়লো নির্মলবাবুর কথা। বাড়ী ফিরবার পথে সৌম্য আগে পোস্টাপিসে গিয়ে নির্মলবাবুকে এ সংবাদ জানিয়ে একটা তার করলো, তারপর পদ্মপিসীর বাড়ী গিয়ে সৌম্য বললে : পিসীমাকে ডাকো, আমি পাশ করেছি।

পদ্মপিসী আগেই সৌম্যর কথা শুনতে পেয়েছিলেন, এগিয়ে এসে বললেন : আমরা সবাই খবর পেয়েছি, রতনকে বলছিলাম আজ হরির-লুট দিবি না, সন্দেশ তৈরী কর।

সৌম্য পিসীমাকে প্রণাম করলো। পিসীমা আশীর্বাদ করলেন।

বাড়ী গিয়ে সৌম্য দেখলো—মা বাইরের দরজায় তার জন্য অপেক্ষা করছেন। সৌম্য প্রণাম করতেই মা তাকে বুকে টেনে নিলেন, বললেন : আমি আগেই খবর পেয়েছি সমু। নীরু আমায় বলে গেছে। ওরাও সকলে পাশ করেছে, তবে তোমার জন্য ওরা খুব খুসী, কত আনন্দ করে গেল। ওদের খাওয়াতে হবে সে কথা বলে গেছে। পিসীমাকে খবর দিয়ে এসেছ? রতনকে বলেছ? ওরা কত ভাবছে। সন্ধ্যাবেলা বলাই কাকাকে প্রণাম করে এসো বুঝলে?

সৌম্য মায়ের সব কথাই শুনছিল কিন্তু তার মন চলে গিয়েছিল কোলকাতার একক রোগশয্যাপাশে। নির্মলবাবু তার পেয়ে নিশ্চয় খুব খুসী হবেন। আজকের প্রথম প্রণামটি যদি সে নির্মলবাবুকে করতে পারতো তা হলে জীবনটা যেন সার্থক মনে হতো।

কয়েকদিন চলে গেছে। নির্মলবাবুর কাছে থেকে একক পোস্টকার্ড এসেছে আশীর্বাদ বহন করে। লিখেছেন : আজ যদি আমি রতনপুরে যেতে পারতাম সৌম্য, তা'হলে কত যে খুসী হতাম। কিন্তু এ জীবনে হয়তো আর কোথাও যাওয়া হবে না, তাই এখান থেকেই তোমাকে আন্তরিক আশীর্বাদ জানাচ্ছি।

নির্মলবাবুর চিঠিখানা সৌম্য মাথায় ছোঁয়ালো—তারপর সযত্নে বাক্সয় তুলে রাখলো।

পদ্মপিসী এসে বললেন : ছেলেকে এবার পড়তে কোলকাতা পাঠাতে হবে বৌ, বুঝলে? তোমার ছেলে নিজেই পড়বে, তোমাদের সাহায্য না নিয়ে তার ব্যবস্থা হয়েই গেছে। আমার এক খুড়তুতো ভাই থাকে কোলকাতায়। তাদের ওখান থেকে সমু পড়াশুনা করবে, তোমাকে না বলেই আমি লিখে দিয়েছি। এদিকে যা গোছগাছ করবার করে ঠিক করো, উত্তর এলেই রওনা হবে।

গ্রাম থেকে আরো কয়েকটা ছেলে কোলকাতায় পড়তে যাচ্ছে, তাদের মধ্যে দীপু, নীরু, কালুও ছিল। মা তাদের বারে বারে বলেছেন : তোরা সৌম্যকে দেখিস বাবা, কোনও দিন আমায় ছেড়ে থাকেনি।

তারপর যাত্রার দিন এলো।

অনেক কথাই আজ যাবার দিন সৌম্যর মনে ভীড় করে আসছে, মনটা যেন কেমন হয়ে যাচ্ছে, কোথায় যেন বেদনা বোধ হচ্ছে।

ট্রেন ছেড়ে দিলো। পরিচিত প্রিয় গ্রামখানি চোখের সামনে ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেল। কালু, দীপু, নীরুর উৎসাহের অন্ত নেই, জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে তারা কত কি বলছে, তাদের উল্লাসধ্বনি সৌম্যর কানে আসছে।

কোলকাতায় এসে সকলে এতক্ষণ পরে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেলো। একেবারে জনসমুদ্রে সে যেন নিজেকে হারিয়ে ফেললো। কোলকাতার কথা এতদিন সে শুনেছে কিন্তু চোখে দেখেনি। এত লোকের ভিড়, এত বাড়ী, এত গোলমাল

—বাড়ীগুলো আকাশ ছুঁয়ে ফেলেছে, চারিদিকে তাকিয়ে কোথাও একটু সবুজ দেখা যায় না, নরম কিছু চোখে পড়ে না—মনে হচ্ছে একটা দৈত্যের গহ্বরে যেন সে এসে পড়লো।

দু'পাশে এত লোক, এত ট্রাম বাস আর মোটরের সারি, এর মাঝে দিয়ে সৌম্য কোনও রকমে চলেছে, যেন প্রতিপদে বাধা পাচ্ছে, আর কি অস্বস্তি আর ভয় তার মনে—কি করে এখানে সে বাস করবে, কি করে খাপ খাওয়াবে আর লেখা পড়া করবে ভেবেই পাচ্ছিল না।

ভাবতে ভাবতে সৌম্য গিয়ে পৌছলো হলদে রংএর বড় বাড়ীটায়। দরজা যে খুলে দিল সে প্রথমেই জানতে চাইল কাকে চাই, কি চাই ?

আমি রতনপুর থেকে এসেছি—সৌম্য রায়।

তারপরই নামলেন বাড়ীর কর্তা, তাকে ডাকলেন—ভিতরে ডেকে তার থাকবার নির্দিষ্ট জায়গা দেখিয়ে দিলেন। বললেন: তুমি ভাল করে পাশ করেছ পদ্মদিদি তাই জানিয়েছিল, কলেজে পড়বে থাকার জায়গা নেই। তা থাক এখানে, চলে যাবে একরকম। ভর্তি-টর্তি হবে যখন বলো, ছেলেরা চিনিয়ে-শুনিয়ে দেবে।

বিকেলের দিকে সৌম্য নির্মলবাবুর কাছে যাবে মনে করে বেরুলো। কোলকাতা শহরে প্রথম এসে চিনে অন্য পাড়ায় যাওয়া খুব সহজ নয়—তাই এবাড়ীর ছেলেদের শরণাপন্ন হলো। একটি ছেলে কিছুটা সঙ্গ দিল এবং পথের নিশানা ঠিক করে দিয়ে বললে, এইভাবে গেলেই চলবে, অসুবিধা হবে না।

অনেক ঘুরে, অনেক জিজ্ঞাসা করে, এক পথে বার বার গিয়ে অবশেষে সে যখন সেই নির্দিষ্ট বাড়ীটা খুঁজে পেলো—তখন কাছেই গির্জার ঘুড়িতে ঢং ঢং করে সাতটা বাজলো।

সৌম্য বাড়ীর ভিতর ঢুকলো।

বাড়ীতে লোকজন আছে বলে মনে হলো না।

দশ

সৌম্য আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলো—কেউ কোথাও নেই। নীচের ঘরগুলো সব বন্ধ। কাকে ডাকবে, কি করে কোথায় যাবে, কিছুই বুঝতে পারছিল না।

এদিক ওদিক তাকিয়ে উপরের সিঁড়ি দেখতে পেয়ে উপরে উঠতেই একটা ঘর থেকে বেহারী বললে : আরে তুমি কোথা থেকে এলে সৌম্য ?

—দেশ থেকে বেহারীদা। স্যর কোথায় আছেন ?

—ভালো আর কই ? ঐ ঘরে আছেন—যাও।

সৌম্য ঘরের কাছে গিয়ে ডাকলো : স্যর, আমি এসেছি।

—কে ? এসো ঘরের ভিতর।

সৌম্য ঘরের ভিতর গিয়ে দেখলো নির্মলবাবু খাটের উপর শুয়ে আছেন, আশেপাশে বই ছড়ানো, মলিন ও অবসন্ন চেহারা।

সৌম্য ঘরে ঢুকেই প্রণাম করলো, জিজ্ঞাসা করলো : কেমন আছেন ?

হাসলেন নির্মলবাবু, বললেন : সেই রকমই আছি—কিন্তু সে কথা থাক সৌম্য, তোমার কথা বলো। কি ঠিক করেছ ?

মা বলেছেন আপনার সঙ্গে কথা বলে সব ঠিক করতে।

আমার মনে হয় প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হও। তোমার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল এ আমি নিশ্চয় বলতে পারি।

নির্মলবাবু গ্রামের কথা, স্কুলের কথা, শিক্ষকদের কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন।

এমন সময় নীচে মোটরের হর্ন শোনা গেল। তারপর বেহারীর পিছন পিছন ঘরে ঢুকলেন একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক। প্রশান্ত চেহারা, দেখলে শ্রদ্ধা হয়। তিনি এসে নির্মলবাবুর কাছে গিয়ে বসে বললেন : কেমন আছ নির্মল ?

—ভাল আছি। এর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। এ হলো সৌম্য, আমার ছাত্র। আমি রতনপুরে এদের স্কুলেই ছিলাম।

সৌম্য এবার তাঁকে প্রণাম করলো।

তারপর নির্মলবাবু ও তিনি অনেকক্ষণ কথাবার্তা বলতে লাগলেন। সৌম্য চুপ করে বসে শুনতে লাগলো। সে বুঝলো যে ইনিই হলেন নির্মলবাবুর সেই মাস্টারমশাই অধ্যাপক রায়। এঁর কথাই নির্মলবাবুর কাছে সে শুনেছিল।

রাত বেশ হয়েছে। সৌম্য আস্তে আস্তে বললে : আজ যাই স্যর।

নির্মলবাবু উত্তর দেওয়ার আগে তাঁর মাস্টারমশাই বললেন : কোথায় যাবে এত রাত্তিরে ? নতুন কোলকাতায় এসেছ, কিছু চিনতে পারবে না। চলো আমি তোমায় নামিয়ে দিয়ে যাবো।

দু'জনে গাড়ীতে উঠলেন। সমস্ত পথটা তিনি সৌম্যকে সব জিজ্ঞাসা করতে করতে এলেন। সৌম্য যখন বাড়ীর দরজায় নামলো তখন তিনি বললেন : আমার বাড়ীতে একদিন এসো সৌম্য। সৌম্য বাড়ীর ভিতর ঢুকলো। কর্তা উপর থেকে হাঁকলেন : এত রাত অবধি কোথায় ছিলে হে ছোক্‌রা, আমাদের যে ভাবনা হয়, নতুন এসেছ। তাঁর কণ্ঠস্বরে বিরক্তি যেন স্পষ্ট হয়ে উঠলো।

সৌম্য বললে তার মাস্টারমশাইএর কাছে গিয়েছিল।

নতুন জায়গায় এসে সৌম্যর ঘুম আসছিল না। সারারাতই কোলকাতায় গাড়ী চলে বোধ হয়—একটুও নিস্তব্ধ হয় না। গ্রামে সন্ধ্যার পরই ঝিঁঝির শব্দ, ব্যাঙ ডাকার শব্দ পাওয়া যায়—ভালই লাগে। তাদের ঘরের পাশেই বাগান, কত ফুল ফোটে আর তার কত সুগন্ধ ঘর ভরিয়ে তোলে! মায়ের কথাও মনে হলো সৌম্যর। একলা আছেন মা, পদ্মপিসীমা আছেন তাই, না হলে মা যে কি করতেন—। মায়ের কথা মনে হলেই সৌম্যর মনটা ভারী হয়ে ওঠে।

তারপর নির্মলবাবুর কথাও সে ভাবছে। আজ সে জানলো নির্মলবাবু বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। তার যে রকম যোগ্যতা তাতে তিনি অনেক উচ্চপদ পেতে পারতেন। সরকারী খেতাবও তার ভাগ্যে জুটতো। কিন্তু সে সবের মোহ তাঁর ছিল না। তাই তিনি এই অজানা অচেনা পল্লীগ্রামে শিক্ষকতার কাজ নিয়ে গিয়েছিলেন—সেবাব্রত নিয়ে। গ্রামের ও ছাত্রদের কি করে উন্নতি হবে সে কথাই তিনি ভেবেছেন, নিজের সব কথা ভুলে। যতদিন গ্রামে ছিলেন সামান্য শিক্ষক ছাড়া তাঁর চালচলনে আর কিছুই বোঝা যায়নি। শুধু যে তাঁর পাণ্ডিত্যের কথা সৌম্য আজ জানলো তা নয়। তিনি যে অগাধ বিষয়-সম্পত্তির অধিকারী ছিলেন এবং দেশের কাজে তিনি যে মুক্তহস্তে তার বিষয়-সম্পত্তি দান করেছেন সেকথাও জানতে পারলো। দেশের লোক তাঁর এই পরিচয় জানে না। যে রকম লোকের তিনি ছাত্র ছিলেন সেও কম কথা নয়। সত্যি, অদ্ভুত এই মানুষটি, এই অধ্যাপক রায়। মাত্র আজ পরিচয়, তাতেই সৌম্যর মনে হচ্ছিল, তিনি যেন কত কালের পরিচিত। গুরু শিষ্য দু'জনের চরিত্রই অপূর্ব অদ্ভুত!

এতদিন রোগশয্যায় শুয়ে আছেন নির্মলবাবু। বসে বসে যা কিছু কাজ এক হাতে করা যায় সেই লেখাপড়ার কাজ সারাদিন ও রাতের যতটুকু সম্ভব,

করে চলেন। শুধু পড়া আর লেখা—এছাড়া আর কিছুই নয়। লোকজনের সঙ্গ, অযথা গালগল্প এসব কিছুই নেই। কিন্তু তবু সৌম্যর মনে হয় এমন একটা বলিষ্ঠ মন ও জীবন চিরদিনের জন্য যেন তিলে তিলে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। নিজের এই শারীরিক দুঃখের কথা কিছুই বলেন না। কত কাজ জীবনে করবেন ভেবে রেখেছিলেন কিন্তু আকস্মিক রোগের আক্রমণ তাঁর সব বাসনা নষ্ট করে দিল। মনের এই তীব্র দুঃখকেও তিনি প্রকাশ করেন না। সৌম্যর মনে পড়ে মাত্র একবার নির্মলবাবুর মুখে হঠাৎ শুনেছিল: একা থাকার কি কষ্ট তা যদি জানতে।

এগারো

কলেজে ভর্তি হয়ে সৌম্যর মনে হলো এ যেন আর একটা নতুন জগতের সঙ্গে পরিচয় হলো। কত জায়গা থেকে কত ছেলে এক জায়গায় এসে মিলেছে। বাংলা দেশের বাইরে থেকেও কত শিক্ষার্থী এসেছে। অনেকের সঙ্গে তার আলাপ পরিচয় হলো, দু'চার জনের সঙ্গে বন্ধুত্বও হলো। কালু, দীপু, নীরুরা অন্য কলেজে ভর্তি হয়েছে, ছুটির দিন ছাড়া দেখা হওয়া সম্ভব নয়—তাদের কথা, তাদের জন্য অভাববোধ প্রথম প্রথম খুব মনে হতো, তারপর আস্তে আস্তে সয়ে এলো। এখানে নতুন যাদের সঙ্গে পরিচয় হলো তার মধ্যে সব চেয়ে ভাল লাগতো অমলকে। অমল বাঙ্গালী হলেও তার মা-বাবা থাকেন পেনাঙএ। বহুদিন সরকারী চাকুরী করে অবসর নিয়ে সেখানেই বাস করছেন। অমল সেখানকার স্কুল থেকে পাশ করে কোলকাতায় পড়তে এসেছে। সে কলেজ হোস্টেলে থেকেই পড়ে। পড়াশুনায় অমল মোটামুটি ভালই। ছুটির দিনে তারা লেক, মিউজিয়াম, আলিপুর জু, পরেশনাথের মন্দির, বালি ব্রীজ, বোটানিক্যাল গার্ডেন ইত্যাদিতে বেড়াতে যায়—সবচেয়ে ভালো লাগে দক্ষিণেশ্বর আর বেলুড় মঠ।

বেলুড় মঠে সন্ধ্যাবেলায় গঙ্গার জলে পা ডুবিয়ে বসলে কত ভালো লাগে, তখন মন্দিরে সন্ধ্যারতির সঙ্গে বন্দনা গান মনকে স্পর্শ করে। সূর্য অস্ত গেছে আর সন্ধ্যা নামছে, দূরে গঙ্গার জলে ভাসা ষ্টীমার থেকে কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখা যাচ্ছে। দু'চারখানা জেলে ডিঙ্গী আর মাল বোঝাই নৌকাদের গা ভাসিয়ে চলতে দেখা যায়। ভিতরে মিটমিটে লণ্ঠনের আলো অন্ধকারের বুকে

কাঁপছে। জলের বুকে ছপাৎ ছপাৎ দাঁড়ের শব্দ কানে আসে—আর আসে স্টীমারের তীব্র ভেঁপু, হঠাৎ শুনলে আর্তনাদ বলে মনে হয়। এই পরিবেশে দেশের কথা মনে হয়। মা হয়তো উঠোনের তুলসীমঞ্চে সন্ধ্যাদীপ দিয়ে প্রণাম করছেন। মনে হয় মাকে যদি এখানে নিয়ে আসা যেত কত খুসী হতেন তিনি। তারপর আস্তে আস্তে সকলের কথাই মনে হয়। পদ্মপিসী, রত্না, গ্রামের আরো সব পরিচিত জনদের। ঘরে এসে চারিদিকে ছড়ানো বই দেখে সৌম্যর নির্মলবাবুকে মনে হয়।

অমলও বেশ ছেলে। গল্প করতে করতে কত কথা বলে। তার বাড়ীর কথা, মা-বাবা-ভাই-বোনের কথা, পেনাঙ শহরের কথা, যে মিশনারী স্কুলে সে পড়তো সেখানকার কথা। অমল মাঝে মাঝে বলে: একটা বড় ছুটিতে আমাদের ওখানে চল সৌম্য। মা বাবা বাঙ্গালী দেখলে খুব খুশী হবেন।

সৌম্য বলে: খুব ইচ্ছা করে অমল—কিন্তু আমার মা পথ চেয়ে থাকেন কবে আমার ছুটি হবে, আমি বাড়ী যাবো। আমি ছাড়া মার আর কিছু নেই। মার কথা ভাবলে আমার আর কোথাও যেতে ইচ্ছা করে না।

মার কথা বলতে বলতে সৌম্য উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। অমল অবাক হয়ে শোনে। সৌম্য বলে: আমার আর একজন শ্রদ্ধার লোক আছেন, তিনি নির্মলবাবু। তাঁর কথা সব এক মুখে বলে ফুরাতে পারবো না ভাই। কি মানুষ তিনি তা বলা যায় না। আমি বরং একদিন তোমায় তাঁর কাছে নিয়ে যাবো।

নির্মলবাবুর কথা বলতে বলতে সৌম্যর চোখে মুখে গভীর শ্রদ্ধা ফুটে ওঠে।

অমল নির্মলবাবুকে কোনোদিন দেখেনি, কিন্তু এত কথাই সে তার সম্বন্ধে শুনেছে যে সে মনে মনে নির্মলবাবুর ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে একটা ধারণা করে নিয়েছে। অনেক সময় সে স্বেচ্ছায় সৌম্যর সঙ্গে নির্মলবাবুর সম্বন্ধে আলোচনা করে।

সাধারণ ভাবে দেখতে গেলে অমল আর সৌম্যর মধ্যে সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া কঠিন। অমল ধনীর সন্তান, প্রাচুর্যের মধ্যে তার শৈশব কেটেছে বাংলা দেশ থেকে অনেক দূরে বিদেশে পেনাঙ শহরে, আর সৌম্য হলো বাংলা দেশের পল্লীগ্রামের ছেলে, স্বচ্ছলতার মুখ কোনোদিন সে দেখেনি। কিন্তু তাহলেও এ দু'জনার মধ্যে বন্ধুত্ব কখন যে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে তা ওরা নিজেরাই জানতে পারেনি। অমল বাংলা দেশের বাইরে মানুষ হলেও বাংলার সঙ্গে তার যে অন্তরের যোগসূত্র তা আসলে ছিন্ন হয়নি। অমল সমুদ্র দেখেছে কিন্তু সৌম্যর

মুখে শুনেছে রতনপুরের সেই একফালি নদীর কথা—তাই সমুদ্রের চেয়ে সেটাই যেন তার বেশী আকর্ষণীয় ছিল। বিদেশে সে বহু ধনীর প্রাসাদ দেখেছে তবু সৌম্যর মুখের গল্প রতনপুরের ছোট ছোট কুটীর—তারাই যেন ওকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। বাংলা পল্লীর আধভাঙ্গা দেউল, খড়ে ছাওয়া চণ্ডীমণ্ডপ—অপরিসর পথের ওপর বাঁশের সাঁকো, খেয়া ঘাট, তালদীঘি, ভার্গবী পার হয়ে ওপারে যাওয়া, অজস্র ফল ফুলে ভরা বাগান, সৌম্যর হাতে তৈরী কুন্দ ফুল গাছের কোটা ফুল, আর উঠোনের মাঝে মায়ের তুলসীমঞ্চ—সোঁদা মাটির গন্ধ, জ্যৈষ্ঠ মাসে আম কুড়োবার ছবি—এসবই এত শুনেছে যে তার এদের সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেছে। এ থেকে মা, পদ্মপিসী, রত্নাও বাদ যায়নি। এরা সকলেই অমলের যেন অতি পরিচিত।

বারো

দেখতে দেখতে দু'টো বছর কেটে গেল কোথা দিয়ে তা যেন সৌম্য নিজেই বুঝতে পারছে না। আর মাত্র তিন সপ্তাহ পরে সৌম্যর ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষা সুরু হবে। নির্মলবাবু বলেছেন: প্রবেশিকার চেয়েও তোমায় ভাল করতে হবে সৌম্য, তোমার উপর আমরা আশা করে আছি।

মার চিঠিও এসেছে কয়েকদিন আগে। মা লিখেছেন: নিশ্চয় তুমি ভাল করে পড়াশুনা করছো। আমার আশা তুমি বড় হবে, ভালো করে লেখা পড়া শিখবে—এত দূরে বসে আমি সেই কথাই ভাবি।

পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য বেশ কয়েকদিন সে বাইরে যায়নি। এ কয়দিন নির্মলবাবুর খবরও জানে না। আজ দুপুরের ডাকে সে নির্মলবাবুর একটা চিঠি পেলো।

সৌম্য!

তুমি পরীক্ষার জন্য খুব ব্যস্ত আছ বুঝতে পারছি। যদি সময় করতে পারো আজ বিকেলে একবার কিছুক্ষণের জন্য এসো। আশীর্বাদ রইল।

নির্মল মৈত্র।

চিঠিখানা পেয়ে সৌম্য আর অপেক্ষা করতে পারছিল না। নিশ্চয় কোনো বিশেষ প্রয়োজন হয়েছে, না হলে নির্মলবাবু এরকম চিঠি লিখতেন না। সৌম্য তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লো।

নির্মলবাবুর বাড়ীতে ঢুকেই সৌম্য তরতর করে উপরে উঠে গেল, সামনে বেহারীকে দেখে জিজ্ঞাসা করলো : বেহারীদা, স্যর কেমন আছেন ?

—বিশেষ ভালো নয়। ওঁকে আবার নাকি কোন নতুন ডাক্তারখানায় যেতে হবে। অধ্যাপক সব ঠিক করেছেন।

সৌম্য ঘরের কাছে গিয়ে ডাকলো—স্যর !

—এসো সৌম্য, ভিতরে এসো।

ভিতরে ঢুকে সৌম্য দেখলো এই ক'দিনে যেন নির্মলবাবুর শরীর আরো একটু খারাপ হয়েছে। চোখের কোণগুলো কালি পড়া, মুখটাও শুকনো। মাথার চুল বাতাসে উড়ছে, বড় ক্লান্ত চেহারা ! একটা কাগজ পড়ছিলেন—সেটা রেখে আধশোয়া অবস্থায় বসে সৌম্যকে বিছানায় বসতে বললেন।

পরীক্ষার কথা, কুশল প্রশ্ন, মায়ের খবরাখবর পাওয়া গেছে কিনা—এই সব কথার পর নির্মলবাবু বললেন : তোমার মনে আছে সৌম্য, তুমি তখন ক্লাস টেনএ পড়ো, একদিন আমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে চলে গিয়েছিলে ?

সেদিন সব কথা বলা হয়নি, কথা ছিল তোমার পরীক্ষা হয়ে গেলে কথাগুলো তোমায় শোনাবো কিন্তু তাও সম্ভব হয়নি—আমিই তো শয্যা নিলাম—আমার এ ব্যাধি সারবার নয় তাই সুস্থ হয়ে আবার কাজকর্ম করার আশা আমি ছেড়ে দিয়েছি কিন্তু আমার জন্য অধ্যাপক রায়ের ভাবনার অন্ত নেই, ওঁর ইচ্ছা আমার আরো ভালো করে যাতে চিকিৎসা হয়। ওঁর কথা অমান্য করার ক্ষমতা আমার নেই। তাই দু'একদিনের মধ্যে আমায় চলে যেতে হচ্ছে কোলকাতা ছেড়ে, শুধু কোলকাতা কেন ভারতবর্ষ ছেড়ে যেতে হবে—সব ব্যবস্থা উনি ইতিমধ্যে করে ফেলেছেন। জানি না আর ফিরবো কিনা, তাই যাবার আগে সেই যে কথা বলা হয়নি—আমার প্রয়োজনেই সে কথা তোমায় জানাবো। তাই আজ সব কথা তোমায় বলবার জন্য ডেকে পাঠিয়েছি, কি জানি আর সুযোগ হয় কিনা।

নির্মলবাবু বললেন: সৌম্য, ঐ যে দেরাজটা দেখতে পাচ্ছ, ওটা খোলো, ঐ ডানদিকের কোণে যে চামড়ার ব্যাগ আছে তার মধ্যে কালো মলাটের খাতাখানা বার করে নিয়ে এসো।

সৌম্য খাতাটা বার করে নির্মলবাবুর কাছে দিল।

খাতাটা পেয়ে তিনি সৌম্যকে বলতে লাগলেন: সৌম্য, তিন বছর আগে তোমাকে আমি আমার ঠাকুর্দার কথা বলছিলাম? তিনি নিরুদ্দেশ হয়ে যাবার আগে কয়েক বছর পর একদিন একজন অচেনা বিদেশী লোক আমার হাতে একটা বাণ্ডিল দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। সে বাণ্ডিলের ভিতর ছিল অন্যান্য দু'চারটে জিনিসের সঙ্গে এই খাতাখানা। এখানা আমার ঠাকুর্দার নিজে হাতে লেখা ডায়েরী। এতকাল আমি এখানা নিজের কাছে কাছে রেখেছি। এতে যা লেখা আছে তা নিয়ে আমি আজ পর্যন্ত কারুর সঙ্গে আলোচনা করিনি! কিন্তু এখন আমি দূর দেশে চলে যাচ্ছি তাই ডায়েরীখানা তোমার জিম্মায় রেখে যেতে চাইছি। আমার ঠাকুর্দার শেষ চিহ্ন হিসাবে এখানা আমার কাছে কত মূল্যবান সেকথা নিশ্চয়ই তুমি জানো। আমার ইচ্ছা যে পরীক্ষার পর এই ডায়েরীখানা তুমি মন দিয়ে পড়বে। তখন পড়লেই বুঝতে পারবে কেন আমি তোমাকে পড়াতে চেয়েছিলাম। যাইহোক, এখন এটা নিয়ে তুমি কিন্তু ভেবো না, যত্ন করে রেখে দিও। আমার খবর অধ্যাপক রায়ের কাছে সব জানতে পারবে। আমার যেতে এখনও কয়েকদিন দেরী আছে, আশা করি তার আগে দেখা হবে।

এই বলে নির্মলবাবু সেই কালো মলাটের খাতা সৌম্যর হাতে দিলেন।

আরো কিছুক্ষণ তাঁর কাছে থেকে প্রণাম করে সৌম্য নীচে নামলো। সিঁড়িতে অধ্যাপক রায়ের সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেলো। তিনি উপরে আসছিলেন। বললেন: আরে সৌম্যনাথ যে! কি খবর, কেমন আছ? পরীক্ষা নিয়ে কি খুব ব্যস্ত আছ? যাক্ তোমাকেই বলছিলাম, চল একটু পাশের ঘরে।

সৌম্যকে নিয়ে অধ্যাপক রায় পাশের ঘরে ঢুকলেন। তিনি বলতে লাগলেন: তুমি জানো, নির্মল আমার কত স্নেহের পাত্র। ওর মত ছাত্র আমি আর একটিও পাইনি। ও আমার ছাত্র কিন্তু ওকে এখানকার যত রকম চিকিৎসা ছিল করা হলো কিন্তু ফল তো কিছুই হলো না, তাই এবার আমি ওকে শেষ চেষ্টা করবার জন্য ভিয়েনা পাঠাচ্ছি। সব ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছে। আমিও একবার শেষ চেষ্টা করে দেখি। কতদিন ওকে ওখানে থাকতে হবে এখন কিছুই বলতে পারছি না। আমার বয়স বেড়ে গেছে, কবে আছি কবে নেই। আমার যে সব ইতিহাসের কাজ করার ইচ্ছা ছিল তা হয়তো সম্পূর্ণ করে যেতে পারবো না, ওর হাতে সেগুলো দিয়ে যেতে চাই—কিন্তু ও যদি এরকম অসুস্থ থাকে তাহলে কাজগুলিও অসম্পূর্ণ থাকবে। এই সব ভেবে আমি ওকে ভিয়েনা পাঠাবার ব্যবস্থা করেছি। তুমি ওকে শ্রদ্ধা কর, তাই তুমি খুসী হবে বলে তোমায় সব বললাম।

অধ্যাপক রায়কে সৌম্য শ্রদ্ধা করতো—আজকের কথা শুনে আরো যেন সহস্রগুণে তা বেড়ে গেল। তাঁকে প্রণাম করে সৌম্য উঠে দাঁড়ালো।

তেরো

খাতাখানি পেয়ে অবধি সৌম্যর ইচ্ছা হচ্ছিল এর মধ্যে কি রহস্য আছে তা জানবার। নির্মলবাবু পরীক্ষার আগে এসব নিয়ে মাথা ঘামাতে বারণ করেছেন, কাজেই এখন এ নিয়ে কিছু না ভাবাই ভাল—এই মনে করে সৌম্য খাতাটা তার ট্রাঙ্কের মধ্যে সব কাপড়ের নীচে রেখে দিল।

তারপর পরীক্ষার জন্য দিনরাত পড়াশুনার মধ্যে ডুবে থেকেছে। কোথা দিয়ে যে দিনগুলো কেটে গেল তা সে নিজেই বুঝতে পারেনি। পরীক্ষা যেদিন শেষ হ'লো তার পরদিন সোজা সে নির্মলবাবুর কাছে গেল। কিন্তু

বাড়ীর সামনে গিয়ে দেখলো বাড়ী বন্ধ, প্রকাণ্ড এক তালা ঝুলছে। সৌম্য অবাক হয়ে কিছুক্ষণ বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকলো তারপর ভাবলো একবার অধ্যাপক রায়ের কাছেই যাই।

অধ্যাপক রায়ের বাড়ীর সামনে এসে সৌম্য ভালো করে দেখলো—হ্যাঁ, এই নম্বরই সে খুঁজছে। দোতলা বাড়ী, সামনে ছোট বাগান। বাগানের ত্ব'পাশে ত্ব'টো বাহারে ঝাউ গাছ, তাছাড়া নানা ফুলের গাছ। ত্ব'পাশে ঘাস আর মাঝখান দিয়ে সরু লাল স্বরকীর রাস্তা যেখানে গিয়ে শেষ হয়েছে সেখানে ত্ব'টো সিঁড়ি উঠেই লম্বা ঢাকা বারান্দা। বারান্দায় উঠে সারি সারি ঘর দেখে সৌম্য কলিং বেল টিপলো। চাকর এসে দরজা খুললো আর সৌম্য একটা কাগজে নাম লিখে দিল। একটু পরেই সাদা পায়জামা আর ঢিলে পাঞ্জাবী গায়ে হন্তদন্ত হয়ে অধ্যাপক নেমে এলেন: আরে এসো এসো সৌম্য।

ত্ব'জনে ঘরে এসে বসলেন। সৌম্য বললে: আমি স্তরের বাড়ী গিয়ে দেখি তালা দেওয়া, উনি কি চলে গেছেন?

—হ্যাঁ সৌম্য, নির্মল চলে গেছে। চলে গেছে কেন? পৌঁছে গেছে চিঠি পেয়েছি।

সৌম্য বললে: আমিও চিঠি লিখবো স্তরকে। কাল আমি দেশে যাচ্ছি মার কাছে।

অনেকক্ষণ কথা বলে সৌম্য সেদিন চলে এলো আর পরের দিন সে, দীপু, নীরু, কালু সকলে এক সঙ্গে বাড়ীর দিকে রওনা হলো।

এখন অখণ্ড অবসর। দিন যেন কাটতে চায় না। এখানে এসেই সে নির্মলবাবুকে চিঠি দিয়েছে, অধ্যাপক রায়কেও চিঠি দিয়েছে। এতদিন সেই ডায়েরীর কথা একেবারে সে ভুলে গিয়েছিল। আজ মা ট্রাঙ্ক পরিষ্কার করে এসে খাতাটা দিয়ে বললেন: এই নাও সমু, এটা বোধ হয় তোমার দরকারী খাতা।

খাতাটা নিয়ে সে পড়তে বসলো:

ছেলেবেলা থেকে আমার মধ্যে একটা বেপরোয়া ভাব ছিল। কি যেন একটা নেশায় আমায় তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াত। আমার বয়সী ছেলেরা যে রকম জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিল আমি সে রকম রুটীন বাঁধা চালচলন পছন্দ করতে পারিনি।……

বাংলা দেশের পল্লীগ্রামে আমার জন্ম। সেখানকার ইস্কুলে লেখাপড়া করতাম, দেশকে আমার ভালই লাগতো। কিন্তু বিদেশে বেড়াবার একটা প্রবল আগ্রহ আমার মনে দেখা দিত।......

একদিন কোলকাতা এসে সটান চলে গেলুম মিলিটারী দপ্তরে। আমি সোজা গিয়ে রিক্রুটিং অফিসারের সঙ্গে দেখা করলাম। আমার চওড়া বুকের ছাতির মাপ হলো, আরো যা তাঁদের দেখবার সব দেখলেন। কিছুদিন আলিপুরে মিলিটারী ব্যারাকে কুচকাওয়াজ, বন্দুকনিশানা ইত্যাদি চললো। মাস ছয়েক পরে একেবারে ইউনিফর্ম পরে বাঙ্গালী পল্টনের সঙ্গে চলে গেলাম পাঞ্জাব সীমান্তে। লাহোর, শিয়ালকোট, আম্বালা, রাওলপিণ্ডি, অমৃতসর, জলন্ধর এই সব জায়গায় ঘুরে কাটলো। তারপর একদিন জঙ্গীলাটের দপ্তর থেকে জরুরী 'তার' এলো আমাদের পল্টনকে তখনি রওনা হতে হবে কাবুল সীমান্তে। তখন কাবুলের আমীরের সঙ্গে ভারত সরকারের যুদ্ধ চলছে।... যথাসময়ে কাবুল সীমান্তে গিয়ে পৌঁছলাম। সেখানে অনেকগুলো ছাউনী পড়েছে। ভারতের নানা প্রদেশ থেকে জোয়ানরা এসে জমায়েৎ হয়েছে। গাড়োয়ালি জাত, শিখ, ডোগরা, পাঠান, বেলুচি, তেলেঙ্গী আরো কত সব। বাঙ্গালী পল্টনই সংখ্যায় সব চেয়ে কম।

সৌম্য পাতার পর পাতা রুদ্ধশ্বাসে পড়ে চলেছে। এরপর ডায়েরীতে লেখা আছে আফগানদের সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধের কাহিনী। সরকারী যুদ্ধের বিবরণে অত খুঁটিয়ে কোন কথা পাওয়া সম্ভব নয়। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রতিদিনকার যুদ্ধের ঘটনা প্রত্যক্ষদর্শী খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লিখে গেছেন।

সেদিন সকাল থেকে নতুন ভাবে তোড়জোড় করে লড়াই সুরু হয়েছে— এবার আক্রমণ চালাবার ভার পড়েছে আমাদের পল্টনের উপর। আমাদের দলটি কয়েকটি ছোট ছোট ভাগে ভাগ হয়ে এগিয়ে চলেছে। আমাদের উপর আদেশ দেওয়া হয়েছে—যতটা এগোনো সম্ভব ততটা যেন আমরা এগিয়ে যাই। শত্রুপক্ষ চুপচাপ বসে ছিল না। রাত ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের কামান থেকে অবিরাম গোলাগুলি বর্ষণ হচ্ছিল। এগিয়ে যাওয়ার বিপদ কত বেশী আমরা তা ভাল করে জানতাম। তবু যতটা সম্ভব আত্মগোপন করে আমরা সন্তর্পণে এগিয়ে চল্লুম। আমাদের পক্ষের গোলন্দাজরাও নিশ্চেষ্ট

ছিল না। আমাদের কামানগুলোও গোলা-গুলি ছুঁড়ে রীতিমত পাল্টা জবাব দিচ্ছিল। একটা জায়গায় গিয়ে আমাদের হাবিলদার যেতে যেতে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন। সামনে একটা ঝোপ, এরপর এগোনো উচিত হবে কিনা তাই তিনি ভাবছিলেন। আমার কি মনে হলো জানি না, ভাবলাম ঐ ঝোপটা পার হতে পারলে শত্রু সৈন্যের অবস্থান ও গতিবিধি ঠিক ঠিক জানতে পারবো। হাবিলদার কিছু বলবার আগেই আমি লাফিয়ে ঝোপের সামনে চলে গেলুম। তারপর কি হলো জানি না।

জ্ঞান হয়ে দেখলাম মিলিটারী হাসপাতালে শুয়ে আছি। সমস্ত শরীরে অসহ্য ব্যথা। তারপর আর একটু সুস্থ হয়ে দেখলাম আমার একটি হাত কাটা গেছে। মাস তিনেক হাসপাতালে থাকার পর ছুটি পেলাম। ফৌজের জীবন থেকে একেবারে মুক্তি।

বাড়ী এলাম কিন্তু মন বসাতে পারি না। ভারতবর্ষের প্রায় সব জায়গায় ঘোরা হলো। ভারতবর্ষের বাইরে কোথায় কি আছে দেখবার ইচ্ছা প্রবল হয়ে দেখা দিল। যখন ফৌজে ছিলাম তখন দেশী বিদেশী বহু লোকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। তাদের কাছে দেশ-বিদেশের কথা শুনেছি। তাদের মধ্যে কেউ কেউ তাদের দেশে যাবার অনুরোধও জানিয়েছে। মনে হলো এবার ব্রহ্মদেশ ঘুরে আসি। বাড়ীতে কাউকে কিছু না বলে একদিন আবার বেরিয়ে পড়লাম। জাহাজে পাড়ি দিয়ে একদিন পৌছলাম রেঙ্গুন শহরে। কিন্তু শহর বেশী দিন ভাল লাগলো না তাই একদিন উত্তর ব্রহ্মের দিকে রওনা হলাম। পথঘাট কিছুই জানা নেই, সঙ্গে টাকাকড়িও বেশী নেই। সে অঞ্চলে চোর ডাকাতের প্রাদুর্ভাবও বেশী। তাহলেও সব কিছু অগ্রাহ্য করে এগিয়ে চল্লাম। শান্ রাজ্যের নানা অঞ্চল ঘুরে ফিরে দেখলাম। ইন্দোচীনের সীমান্ত অবধি চলে গেলাম। এরা আমাদের প্রতিবেশী কিন্তু এদের সম্বন্ধে কতটুকুই বা আমরা জানি! ইচ্ছা ছিল ওদের ভাষা শিখবো, ওদের সঙ্গে ওদেরই একজন হয়ে বসবাস করবো কিন্তু তা সম্ভব হলো না। ফিরে এলাম রেঙ্গুনে।······

হাতে কোনও কাজ নেই। বর্মা আর ইন্দোচীন সীমান্তের যতটুকু জেনেছি তা জেনে তৃপ্তি হলো না। এককালে আমাদের ভারতবর্ষের সভ্যতা কিভাবে সমুদ্র অতিক্রম করে পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে প্রসার লাভ করেছিল তার মোটামুটি কাহিনী ইতিহাসের বই থেকে জেনে নিয়েছিলাম। কিন্তু যতটুকু

জেনেছিলাম তাতে জানার আগ্রহ আরো অনেকখানি বেড়ে গিয়েছিল। তাই এবার ইচ্ছা হলো পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপাঞ্চলগুলি ঘুরে দ্বীপময় ভারত সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করবো।

পেনাঙএ আমার এক ভূতপূর্ব সঙ্গী ছিল। তার সঙ্গে যোগাযোগ করে একদিন জাহাজে রেঙ্গুন ছেড়ে পেনাঙের পথে পাড়ি দিলাম। শুধুই দেশ দেখার সঙ্কল্প নিয়ে যাত্রা করেছিলাম কিন্তু ঘটনার স্রোত আমাকে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে অন্যদিকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। পেনাঙে যাঁর গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করলাম, আমার এই বন্ধুটির নাম জয়রাজম্‌। সে আমাদের ফৌজে রসদ যোগান দিত, সেই সূত্রেই তার সঙ্গে আমার পরিচয়। অন্য সবার চেয়ে আমার সঙ্গেই তার ঘনিষ্ঠতা ছিল বেশী। হাসপাতালে যখন অচৈতন্য হয়ে পড়েছিলাম তখন শুনেছি এই লোকটি প্রতিদিন দু'বেলা আমার সংবাদ নিতো। তারপরেও মাঝে মাঝে তার চিঠিপত্র পেতাম কিন্তু বহুকাল তার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয়নি। আজ এতকাল পরে আমায় পেয়ে তার কথা আর ফুরোয় না। প্রায় সপ্তাহখানেক কেটে যাবার পর আমি বল্লুম, শুধু তোমাদের দেশ নয় এবার পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের যতটা সম্ভব দেখে দেশে ফিরবো।

চৌদ্দ

সেদিন জয়রাজম্‌ অনেক কথাই বললে। ভারতবর্ষে সৈন্যদের শিবিরে এতকাল মালপত্র যোগান দিয়ে সে দেশে ফিরে এসেছিল। কিছুদিন বসে থেকে যখন তার আর ভালো লাগলো না তখন ভারতীয় দ্বীপাঞ্চলগুলিতে— সুমাত্রা, বালি, যবদ্বীপ কোনটাই বাদ গেল না। এইসব দেশ ঘুরে তার অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছিল কিন্তু একটি অভিজ্ঞতার কথা সে আমার কাছে সেদিন বললে—যে কথা সে আর কারুর কাছে প্রকাশ করেনি। ঘটনাটা ঘটেছিল যবদ্বীপে। জয়রাজম্‌ বোরোবুদুরের মন্দির দেখতে যবদ্বীপ গিয়েছিল। মন্দির দেখে তার খুব ভালো লাগলো তাই দিনকতক সেখানে সে থেকে গেল।

সে সময় তার সঙ্গে এক বর্মী ফুঙ্গীর পরিচয় হয়েছিল। তিনি ব্রহ্মদেশে কি করে সভ্যতার বিস্তৃতি হয়েছিল সে সম্বন্ধে অনেক পড়াশুনা করেছিলেন।

তিনি জানতে পেরেছিলেন এই যে সভ্যতা, এ ব্রহ্মদেশ ছাড়িয়েও পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে প্রসার লাভ করেছিল। সেই সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভের জন্য তিনি অনেক কষ্ট স্বীকার করে এদেশে এসেছিলেন। বোরোবুদুরের মন্দিরের কাছেই একটা নির্জন জায়গা তিনি বেছে নিয়েছিলেন। এইখানেই জয়রাজমের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল। তিনি বোরোবুদুরের সম্পর্কে কতকগুলো নতুন খবর তাকে বলেছিলেন। তাঁর সঙ্গে কথা বলে জয়রাজমের এই কথা মনে হয়েছিল যে তিনি এমন কোনো জিনিসের সন্ধান পেয়েছেন যা প্রকাশ হলে একটা আলোড়নের সৃষ্টি করবে। জয়রাজম্ বেশী লেখাপড়া শেখেনি। ফুঙ্গীর সব কথা ভালো করে বুঝতে পারেনি। কিন্তু এটুকু সে বুঝতে পেরেছিল যে কোনো লেখাপড়া জানা বাঙ্গালী যদি এঁর কাছে যায় তাহলে অনেক কিছু মূল্যবান তথ্য জানা যাবে। জয়রাজম্ সে কথাটা এতদিন ভুলে গিয়েছিল। কিন্তু আমি সেখানে যাবো শুনে আজ তার মনে পড়লো আর আমাকে বারে বারে বললে—যে রকম করেই হোক আমি যেন সেই ফুঙ্গীকে খুঁজে বার করি। সেটা তো কয়েক বছর আগের ঘটনা, ফুঙ্গী আজও বেঁচে আছেন কিনা তার ঠিক নেই—

তারপর কোন জায়গা থেকে কোথায় কি ভাবে ঠাকুর্দা গেলেন এবং শেষ পযন্ত কি ভাবে বোরোবুদুরে পৌছলেন সে সব কাহিনী সবিস্তারে লেখা আছে। তারপর মন্দির দেখে ফিরবার পথে কি ভাবে সেই ফুঙ্গীর সঙ্গে ঠাকুর্দার দেখা হলো তা তিনি লিখেছেন।

ফুঙ্গীর দেখা পেলাম। লোকটার অনেক বয়স হয়েছে, চলা ফেরা করার ক্ষমতাও এখন নেই, চোখের দৃষ্টিও ক্ষীণ হয়ে এসেছে। তাঁর কাছে গিয়ে জয়রাজমের নাম করতে প্রথমটা তিনি চিনতে পারেন নি—আমি বাঙ্গালী একথা জেনে খুসীতে তাঁর চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তারপর দু'চারদিন যাওয়া আসার পর একদিন ফুঙ্গী আমায় কাছে বসিয়ে অনেক বললেন: আমি এদেশে যে উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিলাম সে উদ্দেশ্য সফল হবার আগেই শুধু এদেশ থেকে নয় আমায় পৃথিবী থেকেই বিদায় নিতে হচ্ছে। কথাটা কারু কাছে প্রকাশ না করেই আমায় বিদায় নিতে হবে এ দুর্ভাবনা আমার ছিল। আজ তোমাকে পেয়ে আমি অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়েছি। ভারতবর্ষ থেকে

একদিন অনেক লোক সভ্যতা বিস্তারের জন্ত এদেশে এসেছিল। ভারতবর্ষের শৈলেন্দ্র রাজারা যবদ্বীপ অঞ্চলে এক বিরাট সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। তাঁদের রাজত্বকালে এই অঞ্চল জুড়ে বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্ত স্থাপিত হয়েছিল। বাঙ্গালী মনীষী কুমারজীব, শৈলেন্দ্র রাজাদের ধর্মগুরু ছিলেন। এই সব কথা আমি জানতাম কিন্তু এখানে আসবার পর আমি এমন তুটি একটি তথ্য জানলাম যা কেউ জানতো না। সেই তথ্য পৃথিবীর কাছে উদঘাটিত করে যেতে পারবো না। আর বেশীদিন বাঁচবো না, তার আগে সেই কথা তোমার কাছে আমি প্রকাশ করে যেতে চাই।

ফুঙ্গীর কথায় আমি ক্রমশঃ অভিভূত হয়ে পড়ছিলাম। তিনি আবার বলতে আরম্ভ করলেন। এখানে আসবার পর আমি এমন কতকগুলি সূত্র আবিষ্কার করলাম যার সাহায্যে আমি জানতে পারলাম এই যে বিরাট মন্দির পাহাড় কেটে তৈরী করা হয়েছে, পৃথিবীর ইতিহাসে যার জোড়া মেলা ভার —সেই মন্দিরের পরিকল্পনা করেছিলেন এক বাঙ্গালী শিল্পী, যাঁর প্রতিভার কথা শুনে শৈলেন্দ্র রাজারা তাঁকে তাঁদের রাজ্যে আমন্ত্রণ করে এনেছিলেন। তারপর তাঁর পরিকল্পনা অনুসারে যখন এই মন্দির নির্মাণ শেষ হলো তখন সকলেই এক বাক্যে এই শিল্পীর অসামান্ত প্রতিভার প্রশংসার পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন। সকলেই খুসী—কিন্তু সেই শিল্পী খুসী হতে পারছিলেন না। তাঁর কেবলই মনে হচ্ছিল যে দেশ থেকে দূরে এই বিদেশে তাঁর স্থাপত্য কীর্তি অক্ষয় হয়ে থাকবে কিন্তু তাঁর দেশে তাঁর প্রতিভার কোনো স্বাক্ষর রেখে যেতে পারবেন না? এই চিন্তায় শিল্পী অধীর হয়ে উঠলেন। কিছুদিনের মধ্যে তৈরী হলো এমন এক মন্দির পরিকল্পনা যে, সে পরিকল্পনাকে রূপ দিতে পারলে বোরোবুদুরের খ্যাতি ম্লান হয়ে যাবে। আর আমি নিজের চক্ষে সেই পরিকল্পনা দেখেছি। শুধু একবার চোখের দেখা, কিন্তু তার উদ্ধার করতে পারিনি। কোথায় আছে সে পরিকল্পনা তাও আমি জানি—তার সন্ধানও তোমায় আমি দিয়ে যাবো। তবে এখন শুধু এইটুকু বলে যাচ্ছি, যে বোরোবুদুরের মন্দিরের চত্বরের মধ্যেই সে পরিকল্পনার সন্ধান পাওয়া যাবে। যেদিন তুমি এই পরিকল্পনা উদ্ধার করতে পারবে সেদিন বাংলা দেশের শিল্প প্রতিভার পরিচয় পেয়ে পৃথিবীর লোকের কাছে বাংলা দেশের গৌরব কতখানি বাড়বে তা ভাবতে পার কি? তা ছাড়া আরো একটা কথা তোমায় বলছি, এ দেশে বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্ত স্থাপিত হয়েছিল। এই মন্দিরের চত্বরের

মধ্যে এমন একটি বৌদ্ধ ধর্ম-পুস্তক রয়েছে যার অস্তিত্বের কথা আজ পর্যন্ত কেউ জানে না। আর সেই পুঁথিখানা যেদিন উদ্ধার করা সম্ভব হবে সেদিন বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় লেখা সম্ভব হবে এও আমি ভালো করে জানি। আমি এ দু'টি দুর্লভ বস্তুর সন্ধান পাবো। এইজন্যই আমি নিজের দেশ, আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে এই বিদেশে এসেছিলাম। কিন্তু যার সন্ধানে আমি এখানে এসেছিলাম তা আমার নাগালের বাইরে থেকে গেল। ভগবানের অসীম দয়া যে তোমার সঙ্গে আলাপ হলো। আমি যা পারলুম না, তুমি যদি তাতে সফল হও তাহলে পরলোকে গিয়েও আমার আত্মা শান্তি পাবে। ভগবান বুদ্ধের নামে তোমায় আশীর্বাদ করি তুমি সফল হও।

এরপর আমি প্রায়ই ফুঙ্গীর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করতুম। আমি বুঝতে পারছিলাম তাঁর দিন শেষ হয়ে এসেছে। অবশেষে একদিন সেইদিন এলো যেদিন আমারই কোলের উপর মাথা রেখে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

ফুঙ্গী মারা যাবার পর আমার দেশ বেড়ানোর নেশা কেটে গিয়ে একমাত্র ঐ চিন্তা হয়ে দাঁড়ালো কি করে ফুঙ্গীর শেষ ইচ্ছা পূরণ করবো। সব সময় ঐ চিন্তাই মনকে আচ্ছন্ন করে রাখলো। ফুঙ্গীর কথা থেকে জেনেছিলাম যে, সে রহস্য মন্দির চত্বরের মধ্যে রয়েছে—তবে সেটি সহজ প্রাপ্য নয়। প্রকাণ্ড স্থান জুড়ে বিরাট মন্দির, তাতে অসংখ্য কক্ষ, আমি বিদেশী মানুষ, সেখানে ঢুকবার অধিকার নিশ্চয় রয়েছে কিন্তু প্রতিটি কক্ষ, প্রত্যেকটি গোপন স্থান, অনুসন্ধান করার অধিকার আমার নেই। মন্দিরের যাঁরা পুরোহিত ছিলেন তাঁদের সঙ্গে আলাপ করলাম কিন্তু মনের কথা তো তাঁদের কাছে বলা যায় না। আলাপ করে বুঝলাম তাঁদের কাছে এ বিষয়ে কোনো সাহায্যই পাওয়া যাবে না। একা যদি মন্দিরে বার বার ঘুরতে ফিরতে আমায় দেখা যায় তাহলে অকারণ সন্দেহ আসবে আমার উপর আর আমার আসল উদ্দেশ্য সেটা পণ্ড হবে।

শেষ পর্যন্ত অনেক ভেবে-চিন্তে স্থির করলাম সে দেশের রাজ-সরকারের কোনো পদস্থ প্রতিনিধির সঙ্গে আলাপ করে কর্তব্য স্থির করবো। এই ভেবে সুরাবায়াতে চলে এলাম। এখানে এসে প্রথমে বোরোবুদুরের মন্দির সম্বন্ধে যে

সব প্রামাণ্য পুঁথিপত্র আছে সেই সব সংগ্রহ করে পড়ে ফেল্লাম। এই শহরের একপ্রান্তে মিষ্টার লেভি নামে এক ওলন্দাজ ভদ্রলোক থাকেন। বহুদিন সরকারী কলেজে অধ্যাপনা করে ইনি সম্প্রতি অবসর নিয়েছেন। তিনি বোরোবুদুর সম্বন্ধে অনেক নতুন সংবাদ দিলেন। তাঁরই চেষ্টায় ওলন্দাজ সরকার মন্দির-কর্তৃপক্ষের কাছে একটি চিঠি লিখে আমায় দিয়ে দিলেন। তাতে লেখা হলো আমাকে যেন মন্দিরে চলাফেলার অবাধ অধিকার দেওয়া হয়। পরদিন সকালেই বোরোবুদুর ফিরে যাবো মনে করে রাত্রে শয্যা নিলাম।······কিন্তু সকালে উঠে মনে হলো প্রবল জ্বর হয়েছে আর গায়ে প্রচণ্ড ব্যথা। দু'তিন দিন এইভাবে কাটলো, লেভিকে খবর দেওয়াতে তিনি এসে আমায় হাসপাতালে ভর্তি করে দিলেন।

ডায়েরীর লেখা এখানেই শেষ হয়েছে।

সৌম্যর মনটা খুব ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো। কিন্তু কয়েক পাতা উল্টে যেতে দেখলো নির্মলবাবুর হাতের লেখায় লেখা রয়েছে—ঠাকুর্দার ডায়েরী যতবার পড়ছি ততই বিস্ময় বোধ করছি। কিভাবে যে তাঁর জীবনান্ত হলো তার হদিশ পেলাম না। হয়তো মিস্টার লেভি কোনো বাংলা দেশের যাত্রীর হাতে দিয়ে এ'খানা পাঠিয়েছিলেন। ঠাকুর্দার লেখা এই অভিজ্ঞতার কাহিনী পড়বার পর থেকে আমি দিনরাত কামনা করেছি যে একদিন তাঁর এই অসমাপ্ত কাজের ভার আমি গ্রহণ করবো। কিন্তু তার আগে আমার কতকগুলো কাজ বাকী ছিল সেগুলি সমাপ্ত করার আগেই আমার জীবনে ঘনিয়ে এলো অপ্রত্যাশিত দুর্যোগ। ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে আমি চলৎশক্তিহীন হয়ে পড়লাম।······

পরের দিন ডাকে ভিয়েনা থেকে নির্মলবাবুর একটি চিঠি এলো। তিনি লিখেছেন: তোমার পরীক্ষা আশা করি ভালই হয়েছে। এখন অখণ্ড এই অবসরকে কি ভাবে ব্যয় করছো? এই সময়টা যদি কোথাও বেড়াতে যেতে পারতে তাহলে দেশের সম্বন্ধে নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারতে। পাঠ্য বই পড়ে এসব অভিজ্ঞতা পাওয়া যায় না। সম্ভব হলে চেষ্টা করো। আমি আগের চেয়ে অনেকটা ভালো আছি।

নির্মলবাবুর চিঠি পাওয়ার পর থেকে সৌম্যর মন আরো চঞ্চল হয়ে উঠলো। ঠাকুর্দার ডায়েরীতে লেখা দেশগুলি আর নির্মলবাবুর চিঠি তার চোখের সামনে এক বিচিত্র জগতের সন্ধান এনে দিল।

ক'দিন ধরে সৌম্য ভেবেছে। ভাবতে ভাবতে এক একবার তার মনে হয়েছে আমিই কেন একবার চেষ্টা করে দেখি না! সে তো বইতে অনেক পড়েছে, নির্মলবাবুর কাছেও অনেক গল্পও শুনেছে, যে তার বয়সী স্বাধীন দেশের কত ছেলেমেয়ে কত বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে দেশ-দেশান্তরে বেরিয়ে পড়েছে। সেই বা পারবে না কেন? মনে হলো অধ্যাপক রায়ের কথা। তাঁর কাছ থেকে এ বিষয়ে সবচেয়ে ভালো উপদেশ পাওয়া যাবে। কোনও একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন।

পরদিনই সে কোলকাতা যাবার জন্য প্রস্তুত হলো। মাকে বললে: আমি দু'চারদিন ঘুরে আসি না, কোলকাতায় অধ্যাপক রায়ের কাছ থেকে।

পনেরো

সৌম্য কোলকাতা এসে অধ্যাপক রায়ের কাছে গেলো, সঙ্গে সেই ডায়েরীটা।

অধ্যাপক রায় তার হাত থেকে খাতাটা নিলেন আর বললেন: তুমি যে ক'দিন কোলকাতায় থাকবে সৌম্য, এইখানেই যদি থাক তাহলে আমি বড় খুসী হই। আজ আমার কোনো কাজ নেই, দুপুরে ডায়েরীখানা পড়বো। তুমি থেকে যাও।

সৌম্য মনে মনে খুসী হয়েই রাজী হলো।

বিকেলে অধ্যাপক রায় সৌম্যকে বললেন: আমি সব পড়েছি সৌম্য, এখন এ বিষয়ে তুমি কি আলোচনা করতে চাও বলো।

সৌম্য হঠাৎ বলে উঠলো: আমি যেতে চাই, স্যরের ইচ্ছা পূর্ণ করতে চাই!

অধ্যাপক রায় একটু ভেবে বললেন: এ বিষয়ে আমার সম্পূর্ণ অনুমোদন আছে। তোমার যা কিছু সাহায্য দরকার আমি করবো। তুমি নির্মলের যোগ্যতম ছাত্র। তুমি যদি আজ নির্মলের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতে পারো সৌম্য, তার চেয়ে আর ভালো কিছু হতে পারে না। তুমি যদি সফল হও তাহলে বিজ্ঞজন-সমাজে তোমার জয়-জয়কার পড়ে যাবে। আমি সব ব্যবস্থা করে দেবো, তোমার কিছু ভাবনা নেই। বরং তুমি একটা কাজ

করো। আমার লাইব্রেরীতে তোমার জন্য কতকগুলি বই বেছে রাখবো, সেগুলিতে পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ সম্বন্ধে তুমি অনেক তথ্য জানতে পারবে। সেগুলি তুমি পড়ে নিও।

অধ্যাপক রায়ের লাইব্রেরী ঘরটি এর আগে সৌম্য দেখেনি—সেদিন সেখানে ঢুকে বিস্মিত হলো। চারিদিকে কাঁচের আলমারী ভর্তি বই আর বই। টেবিলের উপর কতকগুলি বই আলাদা করে রাখা হয়েছে। সেগুলি সে দেখতে লাগলো।

এই সব বইগুলি পড়তে পড়তে তার চোখের সামনে একটা নতুন জগৎ খুলে গেল।—

প্রায় দু'হাজার বছর আগে ভারতবর্ষের বণিক আর ধর্মপ্রচারকের দল সমুদ্রের বাধা অতিক্রম করে পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপ অঞ্চলে এসেছিলেন। ক্রমে এঁদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে লাগলো। ভারতবর্ষের সঙ্গে দ্বীপাঞ্চলের যোগ ক্রমশঃ ঘনীভূত হয়ে উঠলো। পরবর্তী পাঁচশো বছরের মধ্যে মালয়, কম্বোডিয়া, আনাম, সুমাত্রা, জাভা, বলি, বোর্নিও এইসব জায়গা জুড়ে গড়ে উঠলো অসংখ্য হিন্দু উপনিবেশ।

কাশ্মীরের রাজপুত্র গুণবর্মন্ পশ্চিম জাভায় বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য এসেছিলেন আর তাঁরই চেষ্টার ফলে এই অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্য স্থাপিত হয়েছিল। এর কিছুকাল পরে সুমাত্রা দ্বীপে হিন্দুরাজাদের অধীনে এক পরাক্রান্ত রাজ্য স্থাপিত হয়েছিল। এই রাজ্য শ্রীবিজয় রাজ্য নামে পরিচিত ছিল।

অষ্টম শতক থেকে এই দ্বীপময় অঞ্চল জুড়ে শৈলেন্দ্র রাজাদের অধীনে মধ্য জাভাকে কেন্দ্র করে স্থাপিত হয়েছিল এক বিরাট সাম্রাজ্য। শৈলেন্দ্র রাজারা ছিলেন মহাযান সম্প্রদায়ভুক্ত বৌদ্ধ। এঁদের ধর্মগুরু ছিলেন বাঙালী পণ্ডিত কুমারঘোষ। ঐশ্বর্য আর শক্তি-সামর্থ্যে শৈলেন্দ্ররাজারা ছিলেন অদ্বিতীয়। এঁদের রাজত্বকালে বোরোবুদুরের মন্দির স্থাপিত হয়েছিল। দু'শো বছরের বেশী প্রাধান্য ভোগ করার পর শৈলেন্দ্রবংশের পতন আরম্ভ হয়।

খৃষ্টীয় নবম শতক থেকে যবদ্বীপ অঞ্চলে হিন্দুসভ্যতার পুনরভ্যুদয় হয়। এই সময় যেন বোরোবুদুরের বৌদ্ধকীর্তিকে পরাভূত করার জন্য যবদ্বীপের স্বাধীন রাজারা মধ্য যবদ্বীপে প্রাম্বানানের বিরাট মন্দির শ্রেণী গড়ে

তুলেছিলেন। এইসব মন্দিরের গায়ে খোদাই করা আছে রামায়ণের ঘটনা অবলম্বন করে অসংখ্য চিত্র।

খৃষ্টীয় দশম থেকে ষোড়শ শতাব্দী এই দীর্ঘ ছ'শো বছর পরে যবদ্বীপে মুসলমান শাসন স্থাপিত হয়। তারপর এই দ্বীপাঞ্চল জুড়ে ওলন্দাজদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু বিদেশী শাসনকালেও এই অঞ্চলের হিন্দুসভ্যতা ও সংস্কৃতির চিহ্ন লোপ পায়নি।

সৌম্য বিস্মিত হয়ে গেল।

তার বার বার মনে হতে লাগলো কাশ্মীরের রাজপুত্র গুণবর্মনের কথা। রাজ ঐশ্বর্য, নিশ্চিত জীবনযাত্রার প্রতিশ্রুতি, এসব ছেড়ে দিয়ে ভিক্ষুর চীরবাস সম্বল করে তিনি একদিন বেরিয়ে পড়েছিলেন দুর্গম পথে। কাশ্মীর থেকে কন্যা কুমারিকা পর্যন্ত ঘুরে তিনি সিংহল দ্বীপে এলেন, তারপর সিংহল থেকে সমুদ্র পথে এলেন যবদ্বীপে।

মনে পড়লো বাঙ্গালী কুমারঘোষের কথা, যিনি পাণ্ডিত্য এবং ধর্মপ্রাণতার জন্য শৈলেন্দ্ররাজাদের রাজগুরুর পদলাভ করেছিলেন।

মনে পড়লো শ্রীজ্ঞান দীপঙ্কর অতীশের কথা, যিনি পণ্ডিতপ্রবর চন্দ্রকীর্তির কাছে বৌদ্ধধর্ম ও শাস্ত্র অধ্যয়ন করার জন্য সুদূর নালন্দা থেকে যবদ্বীপে এসেছিলেন।

মনে পড়লো শৈলেন্দ্ররাজা বালপুত্রদের কথা, যিনি নালন্দার বৌদ্ধ বিহার নির্মাণে প্রভূত অর্থব্যয় করেছিলেন। চোখের সামনে ভেসে উঠলো আকাশ ছোঁয়া বোরোবুদুরের বৌদ্ধমন্দির, প্রাম্বানানের হিন্দুমন্দির শ্রেণী। ভারতীয় সভ্যতার স্মৃতিপূত এই দ্বীপাঞ্চল দর্শন করার সুযোগের অপেক্ষায় সৌম্য চঞ্চল হয়ে উঠলো।

ক'দিন এই রকম পড়াশোনার ভিতর দিয়ে কাটলো।

এবার সৌম্যর অমলের কথা মনে পড়লো। সে অমলকে চিঠি লিখলো। সে যে পেনাঙ যাচ্ছে সেই খবরটা তাকে জানালো। এইবার মার কাছে চিঠি লেখার পালা। অনেক ভেবে-চিন্তে সৌম্য মাকে একটু বুঝিয়ে গুছিয়ে লিখলো—মা যেন না ভাবেন। সে অধ্যাপক রায়ের সঙ্গে কিছুদিন বিদেশে ঘুরতে যাচ্ছে। সত্যি কথা লিখলে মার ভাবনার অন্ত থাকবে না।

ষোল

জাহাজ অনেকখানি এগিয়ে এসেছে। দূর থেকে তটভূমির ক্ষীণ রেখা, জেটি আর আশেপাশের গাছপালা, চিমনীর কালো কালো ধোঁয়া, দেখা যেতে যেতে অবশেষে সব মিলিয়ে গেল।

কেবিনে ঢুকে বিছানায় শুয়ে সৌম্যর মায়ের কথা আরো বেশী মনে হলো!

পরদিন সকালে উঠে ডেকে এসে দাঁড়িয়ে সৌম্য যে দৃশ্য দেখলো—তাতে যেন মন ও দেহের গ্লানি কেটে গেল। কিছুক্ষণ আগে সূর্যোদয় হয়েছে। ঝকঝকে রোদে ভরে গেছে, পরিষ্কার আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে সাদা মেঘের টুকরো। যতদূর চোখ যায় জল আর জল। এই রকম দৃশ্য সৌম্যর দৃষ্টিতে প্রথম। পৃথিবীতে এমন এক উদার বিস্তৃতি রয়েছে তা সে প্রথম উপলব্ধি করলো। অনেক যাত্রীও এর মধ্যে এসে ডেকে দাঁড়িয়েছেন কিন্তু তার বয়সী কেউ ছিল না, কাজেই তার কারুর সঙ্গে তেমন আলাপ হলো না। প্রথম দু'দিন জাহাজের ঢেউএর দোলায় তার শরীর একটু খারাপ হয়েছিল, তারপর জাহাজের ডাক্তার কি এক ওষুধ খাওয়ালেন আর কয়েক ঘণ্টা বিশ্রাম নেবার পর সে চাঙ্গা হয়ে উঠলো।

ক্রমে জাহাজ এসে ভিড়লো মলাক্কার উপকূলে। সৌম্য জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়েছিল—সামনে দেখা গেল অর্ধবৃত্তাকার তীরভূমি। দীর্ঘ ঋজু নারিকেল বৃক্ষ শ্রেণী। এই নারিকেল গাছগুলো যেন এই রাজ্যের প্রহরী।

সকলেই ভীড় করে দাঁড়িয়েছে। জাহাজও আস্তে আস্তে এসে বন্দরে ভিড়লো। সৌম্যও জাহাজ ছেড়ে নামলো। অধ্যাপক রায় যে ভাবে নির্দেশ দিয়েছিলেন সেইমত পেনাঙএর দিকে যাত্রা করলো।

আগে থেকে অমলকে জানান ছিল, নেমেই সে অমলকে দেখতে পেলো—সে তারই জন্য অপেক্ষা করছে।

অমলের বাড়ীতে বিরাট অভ্যর্থনা পেলো সৌম্য। তার মা বাবা সকলের আন্তরিক ব্যবহারে সৌম্য মুগ্ধ হয়ে গেল। অমলের খুব ইচ্ছা যে সৌম্য যেন কিছুদিন ওখানে থাকে কিন্তু সে বললে, তার বেশী দিন থাকার উপায় নেই, সে অধ্যাপক রায়ের কিছু কাজ নিয়ে এসেছে সেজন্য তাকে যবদ্বীপ যেতে হবে। অমলের বাবা সেকথা শুনে বললেন: তুমি একা যাবে কি সৌম্য? ওখানে তোমার কি কেউ আত্মীয়-স্বজন বা পরিচিত আছেন?

সৌম্য বললে, না তার কেউ নেই। অমলের বাবা বললেন: তাহলে একা যাওয়াটা ঠিক হবে বলে মনে হয় না। আমার পরিচিত এক ভদ্রলোক ওখানে আছেন, সুরাবায়াতে তিনি থাকেন, জাতিতে ওলন্দাজ। আমি তাঁকে যতদূর জানি তিনি তোমাকে সাহায্য করতে পারলে খুশী হবেন। আমি তাঁকে একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি।

সৌম্যর হাতে যে চিঠি অমলের বাবা দিলেন তার খামের উপর যে নাম লেখা সেটা পড়ে সৌম্য চমকে উঠলো। চিঠিখানা মিঃ লেভির নামে। নামটা দেখে তার আবার ঠাকুর্দার ডায়েরীর কথা মনে পড়ে গেল।

পেনাঙ থেকে আবার জাহাজে উঠতে হলো। এবারের জাহাজ মাদ্রাজের জাহাজ থেকে অনেক ছোট, কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সুমাত্রার বেলওয়াস বন্দরে পৌঁছলো—এখন আর তেমন খারাপ লাগছে না। জাহাজ চড়া খানিকটা অভ্যাস হয়ে গেছে। খালাসীরা মালয় জাতীয়, আর চাকরবাকরদের বেশীর ভাগ হলো চীনা। জাহাজে বেশী যাত্রী ছিল না আর তাদের মধ্যে ভারতীয় মাত্র দু'চার জন। সৌম্যর সঙ্গে তাদের সামান্য পরিচয়ও হলো। জাহাজ যতক্ষণ বন্দরে ছিল তখন ঐ ভারতীয় যাত্রীদের সঙ্গে সৌম্যও সুমাত্রার শহর কিছুটা ঘুরে এলো। প্রতিদিনই যেন তার নতুন অভিজ্ঞতা হচ্ছে।

এখান থেকে জাহাজ সোজা পাড়ি দিল যবদ্বীপের দিকে।

দেখতে দেখতে জাহাজ বাটাভিয়ার কূলে এসে পৌঁছলো। সামুদ্রিক বন্দর এটা। এক সময়ে যবদ্বীপের রাজধানী ছিল। জাহাজ থেকে নেমে সৌম্যর মনে হলো এটা দ্বিতীয় কোলকাতা। সেই রকম কর্মব্যস্ততা, মালপত্র ওঠা নামা, কুলী, ঠেলাগাড়ী, হাঁকাহাঁকি আর গিসগিস লোক। তারপর গাড়ী ভাড়া করে যখন শহরের ভিতরে এলো তখন এখানের দৃশ্য দেখে তার ধারণা বদলে গেল। কোলকাতার চেয়ে এ শহর অনেক সুন্দর, অনেক ঝকঝকে। ক'বছর আগের খবর সে কাগজে পড়েছে যে জাপানী বোমার তাণ্ডব চলেছিল এ শহরের বুকে। তারপর ওলন্দাজদের বিপক্ষে যখন এই দ্বীপাঞ্চলের অধিবাসীরা স্বাধীনতা সংগ্রাম করছিল তখনও যুদ্ধের বিভীষিকা থেকে এ শহর রক্ষা পায়নি। এতো এই সেদিনের কথা কিন্তু এরই মধ্যে সমস্ত শহরে আবার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এসেছে। যুদ্ধের ক্ষতের সামান্য চিহ্ন মাত্র নেই।

সৌম্য একটা হোটেলে গিয়ে উঠলো। কোনোরকমে রাতটুকু কাটিয়ে সকালবেলা স্টেশনে গিয়ে টিকিট কিনে ট্রেনে উঠলো।

সুরাবায়াতে যখন পৌছল তখন সন্ধ্যা হতে আর দেরী নেই। এখান থেকে হোটেলে গিয়ে উঠলো। সম্পূর্ণ একা এতখানি চলে এসে এখন যেন নিজেকে ভারী একলা মনে হচ্ছে।

সকালে যখন ঘুম ভাঙ্গলো তখন অনেক বেলা হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি চা খেয়ে বেরিয়ে পড়লো। তারপর একটা ভাড়াটে গাড়ীতে উঠে মিঃ লেভির ঠিকানাটা বললে। গাড়ীওয়ালা তাকে নিয়ে চললো।

শহর ছাড়িয়ে শেষ প্রান্তে মিঃ লেভির বাড়ী। সেখানে পৌছে খবর দেওয়ার পর একজন আধাবয়সী ভদ্রলোক নেমে এলেন। তিনিই মিঃ লেভি। জাতিতে ওলন্দাজ হলেও ইংরাজী এঁর ভালো জানা আছে। কাজেই দু'জনে কথা বলতে অসুবিধা হলো না। সৌম্য তাঁকে চিঠিখানা দিল।

মিঃ লেভি সৌম্যর সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বললেন—তার বাড়ীর কথা। অমলদের কথা ইত্যাদি। কিন্তু সৌম্য তখন ভাবছে—এখনি তার আসল উদ্দেশ্যের কথা বলবে কিনা। এমন সময় মিঃ লেভি নিজেই বললে: তুমি বাংলাদেশ থেকে এসেছ। আমি অনেকদিন থেকেই ভাবছিলাম যে কোনো বাঙ্গালীর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। আমার ছাত্রজীবনে তোমার বন্ধু অমলের বাবা মিঃ ঘোষের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল—কিন্তু তারপর তিনি চলে গেলেন পেনাঙ, আমি থাকলাম সুরাবায়াতে। দু'জনে দেখা সাক্ষাৎ হয়নি আর, মাঝে মাঝে কুশল প্রশ্নের বিনিময় চিঠিতে হয়। ভ্রমণবিলাসী দু'চারজন বাঙ্গালী এদিকে এসেছেন কিন্তু তাঁদের সঙ্গে আমার তেমন পরিচয় হয়নি।

সৌম্য জিজ্ঞাসা করলো: আপনি বাঙ্গালীর সঙ্গে পরিচয়ের জন্য এত উৎসুক হয়ে উঠেছেন কেন?

তখন তিনি বললেন: সে সব অনেক কথা—তোমার তো এখন হোটেলে ফিরতে হবে না। আমার কাছে এসেছ, এবেলা থাক,—সব কথাই বলবো।

লেভি-পরিবারের আতিথেয়তায় সৌম্য মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। তারপর দুপুরের আহারাদির পর দু'জনে মিঃ লেভির লাইব্রেরীতে গিয়ে বসলো। সে ঘর কেবলই বইয়ের আলমারীতে ভর্তি। মিঃ লেভি বললেন: এ সমস্ত বই

আমার বাবার। তিনি দিনরাত লেখাপড়া নিয়ে থাকতেন। এই তিন চার বছর হবে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। আমার বাবার মুখে একটা ঘটনা শুনেছিলাম, তা আমি তোমায় বলবো। অনেক বছর আগের কথা, আমি তখন খুব ছোট, একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক বাবার কাছে এসেছিলেন এবং বোরোবুদুরের মন্দিরের সম্পর্কে অনেক তথ্য জানতে চেয়েছিলেন—তাই বাবা তাঁর আগ্রহ দেখে তাঁর নামে ওলন্দাজ সরকারের কাছে তাঁর পরিচয়-পত্র দিলেন যাতে তিনি মন্দিরে চলাফেরার অবাধ সুযোগ পান। তিনি বাবাকে অনেক ধন্যবাদ দিয়ে বিদায় নিলেন কিন্তু তার কয়েকদিন পরেই খবর পাওয়া গেল সেই ভদ্রলোক খুব অসুস্থ। বাবা তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়েছিলেন

কিন্তু সেখানেই তাঁর মৃত্যু হলো। সঙ্গে যে কাগজ-পত্র ছিল, আর ছিল একটা ডায়েরী, তাতেই নাম ঠিকানা পাওয়া গিয়েছিল। বাবা সেটা ঐ ঠিকানায় পাঠাবার ব্যবস্থা করেছিলেন বটে, কিন্তু আরো কতকগুলো কাগজ ছিল যা পাঠান হয়নি। বাবা সেগুলো পাঠাতে ভুলে গিয়েছিলেন। পরে সেইসব কাগজপত্র দেখে তাঁর মনে হলো যদি কোনো বাঙ্গালী এদিকে আসেন তাহলে ঐগুলো তাঁকে দিয়ে দেবেন। ঐ মৃত ভদ্রলোক যে কাজে হাত দিয়েছিলেন তা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বাবা সে রকম বিশ্বাসযোগ্য কারুর সাক্ষাৎ পাননি।

বাবা মারা যাওয়ার পর আমি চেষ্টা করেছি। কিন্তু আমিও নির্ভরযোগ্য বাঙ্গালীর সন্ধান পাইনি। তোমাকে প্রথম থেকে দেখেই মনে হচ্ছে যে তোমাকে বিশ্বাস করতে পারি, এইসব কাগজপত্র তোমাকে দিলে তার সদ্ব্যবহার হতে পারবে। এতে কি যে লেখা আছে তা আমি জানি না তবে বাবার কাছ থেকে যা শুনেছি তাতে মনে হয় যে এর ভিতর এমন ইঙ্গিত আছে যার ফলে ইতিহাসের ক্ষেত্রে অনেক বিস্ময়কর নতুন কথা জানা যাবে।

সৌম্য যতই লেভির কথা শুনছিল ততই তার মনটা খুশি হয়ে উঠছিল। এতদিন তার ধারণা ছিল—শুধু এই ডায়েরীখানার উপর নির্ভর করে তাকে কাজ করতে হবে—কিন্তু এখন সে বুঝলো যে আরো অনেক কাগজ পত্র পাবে—যাতে তার কাজের আরো সুবিধা হতে পারবে।

মিঃ লেভি তাকে কতকগুলো জীর্ণ বিবর্ণ কাগজপত্র এনে দিলেন।

সৌম্য কাগজগুলি নিয়ে বললে যে, সেই ভদ্রলোকের ডায়েরীখানা তার হাতে পড়েছে এবং সেইজন্যই সে এতদূর এসেছে এই সবের অন্বেষণে।

হোটেলে ফিরে এসে সৌম্য কাগজগুলো নিয়ে পড়তে বসলো।

প্রথম কাগজখানি একটা নক্সা। তার পাশে যতদূর মনে হয় বর্মী ভাষায় কি লেখা। তার মনে হলো এই নক্সা হয়তো সেই মন্দির সংক্রান্ত কিছু হতে পারে। আর সে সব কাগজে যা লেখা আছে তা সংক্ষিপ্ত, তখনকার মত সেগুলো অর্থহীন মনে হলেও যখন কাজ আরম্ভ হবে তখন সাহায্য পাওয়া যাবে মনে হলো।

এইবার সে অমলকে একটা চিঠি লিখলো পৌঁছান খবর ও মিঃ লেভির কথা জানিয়ে।

পরের দিন সকালে উঠে সৌম্য ঘুরে ফিরে শহর দেখছিল। সুরাবায়ার এই শহরটিও বাটাভিয়ার মতই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এ শহরেও যুদ্ধের তাণ্ডব চলে গিয়েছে কিছুদিন আগে। কিন্তু এখন তার স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ফিরে এসেছে।

সারাদিন ঘুরে ফিরে কাটলো, বিকেলে আবার ট্রেনে উঠতে হলো।

এবার সে এসে পৌঁছল জাকার্তা—যবদ্বীপের রাজধানী। এখানে ভারত সরকারের প্রতিনিধির অফিস রয়েছে। প্রথমে সেখানে গেল। গিয়ে দেখলো—অনেক আগেই অধ্যাপক রায় চিঠিপত্র লিখে সব ব্যবস্থা করে

রেখেছেন। সৌম্যকে এতটুকুও অসুবিধায় পড়তে হলো না। ইন্দোনেশিয়ার গবর্ণমেণ্ট ভারত সরকারের অনুরোধ অনুযায়ী সৌম্যকে অনুমতিপত্র দিয়েছেন। যাতে সে বোরোবুদুর অঞ্চলে প্রবেশ অধিকার পাবে এবং যতদিন খুসি সেখানে থাকতে পারবে। তাছাড়া সুরকর্তার এক ভদ্রলোকের কাছে একখানা চিঠি লিখে দিলেন তাঁরা, তাঁরা যেন সৌম্যকে যথাসাধ্য সাহায্য করেন। ভদ্রলোক ইংরাজী ভাষায় অভিজ্ঞ। এ রকম লোকের সাহায্য সৌম্যর খুব দরকার।

জাকার্তা থেকে সে এলো সুরকর্তায়। এখানে যে ভদ্রলোকের কাছে ভারতীয় দূতাবাস থেকে চিঠি দেওয়া ছিল তিনি নিজে স্টেশনে এসেছিলেন ও সৌম্যকে তাঁর বাড়ী নিয়ে গেলেন। তাঁর নাম রাতুলাঙ্গি। ভদ্রলোক ঐ অঞ্চলের স্থায়ী অধিবাসী। ওখানকার খুঁটিনাটি সব তাঁর নখদর্পণে। বিদেশী ভ্রমণকারীদের সব রকমের সাহায্য করা তাঁর প্রধান কাজ। তাছাড়া যবদ্বীপ, বালিদ্বীপ, সুমাত্রা সম্বন্ধে এত তথ্য তাঁর জানা আছে যে এঁকে অনায়াসে একটা শব্দকল্পদ্রুম বলা যায়। ইতিহাসের বইতে যে সব কথা লেখা নেই সে রকম বহু খবর এঁর কাছে থেকে পাওয়া যায়। এ অঞ্চলে বিদেশী বিশেষতঃ ভারতবাসী অনেককাল আসেনি তাই সৌম্যকে পেয়ে রাতুলাঙ্গি খুব উৎসাহ বোধ করলেন। সেদিন বিশ্রাম করে পরের দিন তাঁরা বোরোবুদুর রওনা হলেন। রাতুলাঙ্গির জানা একটা পরিবারে তাঁদের থাকবার ব্যবস্থা হলো। সেখান থেকে মন্দির বেশী দূর নয়।

মন্দিরের সীমানায় প্রবেশ করে সৌম্য বিস্ময়াহত হয়ে ভাবছিল: রাতুলাঙ্গির সঙ্গে সৌম্য যেখানটায় দাঁড়িয়েছিল সেখানটা সবুজ সমতল-ভূমি। সামনে, অদূরে একটা গোটা পাহাড় কেটে বিরাট মন্দির। পাহাড় আর মন্দির ঘিরে পর পর অনেকগুলো পাহাড়ের বেষ্টনী। ধাপে ধাপে অনেকগুলো সৌধ উপরের দিকে উঠে গেছে। সব শুদ্ধ ন'টি স্তর। সব চেয়ে উঁচু স্তর যেটা তার মাথায় মুকুটের মত একটা স্তূপ। নীচে থেকে উপরের দিকে যতটা মন্দির উঠে গেছে তত তার আয়তন সূক্ষ্ম হতে হতে পাহাড়ের শীর্ষদেশে এসে চূড়াব মত হয়ে গেছে। নীচের যে পরিধি সেটা একশো তিরিশ গজেরও বেশী। এই পরিধির তুলনায় উপরকার চূড়া অত্যন্ত ছোট। মন্দিরের পাথরের গায়ে স্তরে স্তরে বহুশত বুদ্ধমূর্তি। বুদ্ধের জীবনের বিভিন্ন ঘটনা অবলম্বন করে নানা মূর্তি পাথর কেটে তৈরী করা। এই মূর্তির সংখ্যা গুণে শেষ করা যায়

না। মন্দিরের গায়ে টানা বারান্দা, নীচে থেকে উপরের দিকে উঠে গেছে, অনেকটা গ্যালারীর মত। সেই গ্যালারী বেয়ে উপরে উঠবার সময় চোখে পড়ে অপরূপ ভাস্কর্য। পাথর কেটে এ রকম জীবন্তের মত ঐ রকম মূর্তি তৈরী করা যায় তা না দেখলে বিশ্বাস হবে না।

দেখে দেখে সৌম্যর তৃপ্তি হয় না। সাধারণ নরনারীর জীবনের আলেখ্য পাথরের গায়ে অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে খোদিত করা আছে।

সৌম্য যতক্ষণ বিস্ময়-বিমুগ্ধ হয়ে মন্দিরের শিল্প-সৌন্দর্য দেখছিল ততক্ষণ পাশে দাঁড়িয়ে রাতুলাঙ্গি হাত পা নেড়ে মন্দির সম্বন্ধে অনর্গল কথা বলে যাচ্ছিলেন; কিন্তু তিনি একটু লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারতেন যে সৌম্যর কানে একটা কথাও ঢুকছে না।

তার ধ্যান ভাঙলো যখন রাতুলাঙ্গি তাকে বললেন: সন্ধ্যা হয়ে এসেছে এবার ফিরে যেতে হবে।

রাতুলাঙ্গির হঠাৎ কি কাজ পড়ে গেল তাই তিনি দু'তিন দিনের জন্য সুরকর্তায় গেলেন। সৌম্যর হাতে কোনো কাজ নেই তাই সে প্রতিদিন বেশীর ভাগ সময় এখানে কাটাতো। ঘুরে ঘুরে দেখে তার যেন আশা মেটে না। মন্দিরে বিশেষ কেউ আসে না, ধূপদীপ জ্বলে না। এ যেন প্রাচীন স্মৃতির বিরাট কঙ্কাল। কখনও কখনও ভ্রমণ-বিলাসীরা আসেন: এ সময় তাঁরাও নেই, কাজেই সৌম্য একলা। মন্দিরের জীর্ণ অবস্থা ক্রমশঃ জীর্ণতর হয়ে আসছিল, তাই আগে কিছু কিছু সংস্কার করা হয়েছিল—সে সব চিহ্ন এখানে ওখানে ছড়িয়ে রয়েছে। গোটা মন্দির যখন দেখা হয়ে গেল তখন পুরানো সেই কাগজপত্রের যে নক্সা ছিল যেটা মিঃ লেভি তাকে দিয়েছিলেন—সেটার সঙ্গে মন্দিরের কোন অংশের মিল রয়েছে সেটাই সে মেলাতে চেষ্টা করলো। প্রথম প্রথম মেলাতে না পেরে তার মনে হলো এটার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই।

কিন্তু সেদিন যখন সে তার অনুসন্ধান সেরে ফিরে আসছিল তখন মন্দিরের একবারে নীচের দিকের একটা অংশে তার দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো। আগে অনেক বার এ জায়গা দেখেছে, কিছু অসাধারণ আছে বলে মনে হয়নি—আজ তার মনে হলো নক্সার সঙ্গে কোথায় যেন এর মিল রয়েছে। এইবার নক্সা খুলে ভাল করে মিলিয়ে দেখলো তার ধারণা ঠিক। মন্দিরের এই বিশেষ অংশটির মাঝখানে একটা ছোট পাথরের দরজা। এই দরজাটায় যতটুকু ফাঁক আছে

তাতে একটা মানুষ অতি কষ্টে যেতে পারে। কৌতূহলী হয়ে সে সেই দরজা দিয়ে ঢুকলো। ঢুকে দেখলো একটা প্রশস্ত কক্ষ কিন্তু অন্ধকার—শুধু যে দরজা দিয়ে সে ঢুকেছিল তারই যৎসামান্য আলো ভিতরে আসছে।

কক্ষটি যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে দেওয়ালের নীচেই এক সিঁড়ি নেমে গেছে। সিঁড়িগুলো পাথরের এবং খাড়াই। দু'এক ধাপ গিয়ে সৌম্য চমকে দাঁড়িয়ে ভাবলো—নেমে যাওয়াই ঠিক হবে কিনা। কারণ ওই ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন সিঁড়ি কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে কে জানে। নীরন্ধ্র অন্ধকার দেখলে মনে হয় পাথরের কারাগৃহ। সৌম্যর মনে হলো—মন্দিরে গর্ভগৃহ থাকে, আর সেখানেই যত মূল্যবান রত্ন ও দুষ্প্রাপ্য বস্তু থাকে। তাই সে সাহসে ভর করে এগিয়ে যাওয়াই স্থির করলে!

এই পথ অত্যন্ত সরু, দু'পাশের দেওয়াল তার গায়ে লাগে। পকেটে যে টর্চ ছিল তা জ্বেলে চলেছে তো চলেছে, পথ যেন শেষ হচ্ছে না। এমনি ভাবে গিয়ে আর একটি বন্ধ দরজার সামনে এসে সে দাঁড়ালো। ধাক্কা দিতেই দরজা খুলে গেল। সামনে দুর্ভেদ্য আর সুরক্ষিত কক্ষ। কক্ষের মাঝখানে পাথরে তৈরী উঁচু বেদী। কিন্তু সে কক্ষ একেবারে শূন্য, কোথাও কিছু নেই। চারিদিকে তাকিয়ে মনে হলো যে গোপন বস্তু সকলের চোখের আড়াল করে রাখবার মত এর চেয়ে উপযুক্ত স্থান আর হতে পারে না। প্রথমে ঢুকে তার মনে হয়েছিল সে যার সন্ধান চায় এখানেই পাবে। কক্ষের দেওয়ালে অথবা মেঝেতে এমন কিছু সন্ধান পাওয়া গেল না যাতে আর কোনো গুপ্ত কক্ষ থাকতে পারে। শুধু বেদীর উপরে একটা দাগ রয়েছে যা দেখে মনে হতে পারে এখানে একটা ভারী জিনিস রাখা হয়েছিল—এখন এই দাগটুকু ছাড়া আর কোনও চিহ্ন নেই। সৌম্য আশা করেছিল এখানে কিছু পাবে, কিন্তু কিছুই পেলো না, সে ফিরে আসার জন্য পা বাড়ালো।

কিন্তু কোথায় যাবে? যে পথ দিয়ে এসেছিল সে পথ কোন্‌দিকে তার কোন চিহ্ন সে পাচ্ছে না। যত এদিক ওদিক ঘুরছে পথ পাবার জন্য ততই নিরেট পাথরের দেওয়াল ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ছে না। এই একটু আগেই তো সে এঘরে ঢুকেছে কিন্তু কোথায় গেল সে দরজা। দরজার কোনো সন্ধান নেই। মনে ভীষণ আতঙ্ক এলো।

সৌম্য আবার ঘরের চারিদিকে ঘুরে দেখলো। এবারেও তার সন্ধান ব্যর্থ হলো। সে ঘর থেকে বেরোবার কোনো উপায় নেই। এখানে চীৎকার করে

মরলেও কেউ শুনতে পাবে না। চারিদিক কী ভয়ঙ্কর নিস্তব্ধ—তার বুকের স্পন্দন আর নিজের শ্বাস-প্রশ্বাসই তার কানে বাজছিল। এবার আর দাঁড়িয়ে থাকা তার পক্ষে সম্ভব হলো না। বেদীর মাঝখানে সে বসে পড়লো। তার মনে পড়লো মায়ের কথা, দেশের কথা—এক এক করে সকলের কথা। আতঙ্কে তার কণ্ঠ থেকে তালু শুষ্ক হয়ে এসেছে। এই পাথরের যক্ষপুরীতেই তাহলে তার জীবন শেষ হয়ে যাবে? ক্রমশঃ যেন তার চৈতন্য লুপ্ত হয়ে আসছে। ঠিক এই রকম সময় তার কানে এলো স্নেহভরা কণ্ঠস্বর—তুমি পারবে সৌম্য, তুমিই পারবে।

লুপ্ত চেতনা যেন ধীরে ধীরে ফিরে এলো। সাহসে ভর করে উঠে দাঁড়াতেই মনে হলো যেন অন্ধকারের পাহাড় সরে যাচ্ছে—আর সেই আধো আলোর মাঝখানে দাঁড়িয়ে মুণ্ডিত মস্তক, পীতবাস পরিহিত এক সৌম্যদর্শন ভিক্ষু। মনে হলো তিনি যেন ইঙ্গিতে তাঁকে অনুসরণ করতে বললেন। সৌম্যর শঙ্কা যেন কমে এসেছে—সে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলো।

কিছুদূর এগিয়ে তিনি আর একটা ক্ষুদ্র কক্ষে প্রবেশ করলেন। সেই কক্ষে মৃদু আলোকে সৌম্য দেখলো ভিক্ষু কোথায় অন্তর্ধান হয়েছেন—ঘরের একদিকে

হাতীর দাঁতের কাজ করা মেহগ্নি কাঠের একটি বাক্স। সৌম্যর মনে হলো যার সন্ধানে সে এতদূর এসেছে তা হয়তো এই বাক্সে পাওয়া যাবে। সে তাই দ্রুত পদে এগিয়ে গিয়ে বাক্সর ডালা তুলে ফেল্লে। তার মধ্যে রয়েছে তালপাতার মোড়ক। মুহূর্ত বিলম্ব না করে সে সেটি তুলে নিয়ে ঘুরে দাঁড়াতেই স্বল্পালোকে দূরে একটা দরজা দেখতে পেলো। সেইখানে আসতে যেন তার মনে হলো এইটাই সুড়ঙ্গের মুখের দরজা। দ্রুত সে পা চালিয়ে উপর দিকে উঠতে লাগলো—। হ্যাঁ, ঠিকই মনে হচ্ছে। এই পথ দিয়েই সে নেমে এসেছিল। ক্রমে ক্রমে সে উঠে এলো সেই আধখোলা পাথর দরজায়।

এইবার সব অন্ধকার কেটে গেছে। আলোর বন্যা এসেছে যেন। প্রবল উত্তেজনার মুহূর্তগুলো কেটে গেছে, সৌম্যর সারা দেহে যেন অবসাদ এসেছে। সেই দরজা দিয়ে বাইরে এসে সৌম্য অনেকক্ষণ চোখ বুঁজে বসে রইল। মনে মনে চিন্তা করতে লাগলো এতক্ষণ যে দৃশ্যগুলো দেখেছে সেগুলো কি। তার মনে হলো এগুলো কোনো অশরীরীর আবির্ভাব তো নয়—এগুলো তার অবচেতন মনের প্রতিক্রিয়া। যবদ্বীপের মাটিতে পা দিয়ে অবধি সে ঠাকুর্দার কথা ও ফুল্পীর কথা এক মুহূর্তের জন্যও ভুলতে পারেনি।

অনেকক্ষণ বসে থেকে একটু সুস্থ হয়ে সে হোটেলে চলে এলো।

সতেরো

আর এখন সৌম্যর কাজ নেই। রাতুলাঙ্গি এলেন—সৌম্য তাঁরই অপেক্ষা করছিল। এতদিন রাতুলাঙ্গিকে সে সব কথা বলেনি, কিন্তু এখন আর বলার কোনো বাধা নেই। অবশ্য এরকম একটা কিছু অনুমান তিনিও করেছিলেন। সব কথা শুনে তিনি খুশি হলেন আর তার সাহসের পরিচয় পেয়ে তাকে বাহবা দিলেন।

সৌম্য তালপাতার জীর্ণ মোড়কটি তাঁকে দিল। প্রথম মোড়কটি পরীক্ষা করে রাতুলাঙ্গি দেখলেন এটা একটা মন্দিরের নক্সা। এরকম মন্দির এখানে নেই, প্রাম্বানানেও নেই, যবদ্বীপ, বালি, সুমাত্রা, এ অঞ্চলের কোথাও নেই। কিন্তু মন্দির পরিকল্পনার গায়ে যে সব পরিকল্পনার কথা লেখা আছে সেগুলো রাতুলাঙ্গি পড়তে পারলেন না। দ্বিতীয় মোড়কটি খুলে যা দেখলেন তাতে রাতুলাঙ্গির বিস্ময়ের অবধি রইল না। জীর্ণ তালপাতা একটার পর একটা

দেখতে লাগলেন। যত দেখতে লাগলেন ততই তাঁর বিস্ময় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগলো। যবদ্বীপের ভাষায় লেখা বৌদ্ধ ত্রিপিটক। অনেককাল আগে যবদ্বীপেও বৌদ্ধধর্মের প্লাবন এসেছিল সেকথা রাতুলাঙ্গির অজানা নয়। কিন্তু যবদ্বীপের ভাষায় কোনো বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ অনূদিত হয়েছিল এই সংবাদ তাঁর জানা ছিল না।

তখন আর বেশী কথা হলো না। বিকেলে রাতুলাঙ্গি সৌম্যকে নিয়ে মন্দিরের পাশে পাহাড়ের উপর একটি নির্জন জায়গায় বসলেন। মন্দিরের দিকে তাকিয়ে রাতুলাঙ্গি অনেক কথাই বলে চললেন। দু'হাজার বছর আগে কি করে এই দ্বীপঅঞ্চলে ভারতীয় সভ্যতার বিকাশ হয়েছিল। ভারতীয়রা এইখানে শুধু সাম্রাজ্যই গড়ে তুলেননি, ভারতীয় ধর্মের দুটি প্রবল স্রোত এ দেশকে ভাসিয়ে দিয়েছিল। একটি বৌদ্ধধর্ম আর একটি শৈবধর্ম। তারপর এসেছে ইসলামধর্মের প্লাবন। সেই বৌদ্ধ আর শৈবধর্মের স্মৃতি লোকের মন থেকে চলে গেল কিন্তু মহাকাল তার স্মৃতিকে এখনও অক্ষুণ্ণ রেখেছে। এই দু'টি ভারতীয় ধর্মের দু'টি জয়স্তম্ভ বোরোবুদুর আর প্রাম্বানানের মন্দির। তাছাড়া আঙ্কোরবন, আঙ্কোরবাট, বায়ানা এইসবও প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির সাক্ষী হয়ে রয়েছে। এর পর রাতুলাঙ্গি সৌম্যর হাত ধরে আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে বললেন: আজ তুমি যা করেছ তার জন্য ভারতবর্ষের লোকে গর্ব বোধ করবে কিন্তু যবদ্বীপবাসীরাও আজ তোমার কাছে কিছুটা কৃতজ্ঞ থাকবে। ভারতীয় সভ্যতার স্মৃতি এতদিন পাথরকে আশ্রয় করে বেঁচেছিল এখন তুমি তাকে সাহিত্যিক-ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছ। যবদ্বীপের ভাষায় লেখা তুমি যে বৌদ্ধ গ্রন্থ উদ্ধার করেছ তা বৌদ্ধধর্মের অগ্রগতির ইতিহাসে একটি গৌরব উজ্জ্বল অধ্যায় রচনা করলো। যে মন্দিরের নক্সাটি তুমি আবিষ্কার করেছ সে সম্বন্ধে আমি কিছু বলতে পারছি না, শুধু এইটুকু জানি এই ধরণের মন্দির পরিকল্পনা পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের কোথাও নেই। আর এও জানি যে এ পরিকল্পনা যদি কেউ রূপদান করতে পারে তবে স্থাপত্য-শিল্পের ইতিহাসে সেটি হবে এক অনুপম কীর্তি।

কথা বলতে বলতে সন্ধ্যা নামলো তাই দু'জনকেই উঠতে হলো।

এবার সৌম্যকে ফিরে আসতে হবে। ক'দিন বাড়ীর জন্য তার মনটা অস্থির হচ্ছে। রাতুলাঙ্গিকে সে ফিরে আসার কথা বললে। রাতুলাঙ্গি তাকে বললেন: তুমি যদি এসব নিয়ে এখনি চলে যেতে চাও তাহলে তোমার যাত্রাটা

নির্বিঘ্ন নাও হতে পারে। কারণ তোমাদের দেশের মত এ দেশেও প্রত্নতত্ত্ব সম্পর্কিত আইন রয়েছে। প্রাচীন যুগের স্মৃতিচিহ্ন যদি কেউ আবিষ্কার করে তাহলে সেটা এ দেশের সরকারকে জানাতে হবে, তুমি তাদের না জানিয়ে এগুলো নিয়ে যাবার চেষ্টা করলে বিপদে পড়তে পারো।

সৌম্য ভাবলো সে স্বাধীন দেশের ছেলে, বিদেশে তার এমন কিছু করা উচিত নয় যাতে তার স্বদেশের সম্মানহানি হতে পারে। তাই রাতুলাঙ্গির সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির হলো পরের দিন জাকার্তায় ভারতীয় দূতাবাসে গিয়ে সব কথা জানাবে।

জাকার্তায় গিয়ে ভারতীয় দূতাবাসে যখন সব কথা বলা হলো তখন তাঁরা খুব আগ্রহ সহকারে সৌম্যকে বললেন তাঁদের কর্তব্য তাঁরা নিশ্চয় করবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ইন্দোনেশীয় সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। ওখানকার প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের যিনি অধ্যক্ষ তাঁর সঙ্গে রাতুলাঙ্গির বন্ধুত্ব ছিল। তাঁকে সব কথা বলায় তিনি এবিষয়ে অগ্রণী হলেন এবং তাঁরই চেষ্টায় মাত্র দু'দিনের মধ্যে ইন্দোনেশীয় সরকার জানালেন, যে মূল গ্রন্থখানা পাওয়া গেছে তার অবিকল অনুলিপি যতশীঘ্র সম্ভব ভারতীয় দূতাবাসে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। মূল গ্রন্থখানা সেই দেশের সরকারের তত্ত্বাবধানে থাকবে। আর মন্দির পরিকল্পনাটির অনুলিপি সঙ্গে করে ভারতীয় দূতাবাসের মারফত সৌম্যকে দেওয়া হলো। সেই সঙ্গে ইন্দোনেশীয় সরকার সমগ্র দেশবাসীর পক্ষ থেকে সৌম্যকে অভিনন্দন জানালেন।

এবার সৌম্য ফিরে আসার জন্য প্রস্তুত হলো।

আঠারো

পেনাঙের জাহাজ-ঘাটে অমল আর তার বাবা সৌম্যর জন্য অপেক্ষা করছিলেন। সৌম্যকে দেখে অমলের বাবা বুকে জড়িয়ে ধরলেন, তাঁর হাতে একখানা সংবাদপত্র। বললেন: আজ তুমি আমাদের অনেক গর্বের পাত্র। এত অল্প বয়সে তুমি যে এতবড় একটা আবিষ্কারের সন্ধানে যাচ্ছ তা আমরা ভাবতেই পারিনি। আজকের এই সংবাদপত্রে তোমার ছবি ও এই সংবাদ দেখে অবাক হলাম।

অমল সৌম্যকে তাদের কাছে কয়েকদিন থাকার জন্য অনুরোধ করলো

কিন্তু সৌম্য রাজী হলো না—মাকে সে সব কথা বলে আসেনি। পরীক্ষার খবর বেরোলে অমল কোলকাতায় পড়তে যাবে, তখন তো আবার একসঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ সবই হবে। এই সব বলে বুঝিয়ে সৌম্য তাদের কাছ থেকে বিদায় নিলো।

আবার সেই জল আর জল। তটহীন সমুদ্র আর সীমাহীন আকাশ এই উদার পরিবেশ ছেড়ে গ্রামের সেই ছোট্ট গৃহটি, যেখানে মা তুলসীমঞ্চে দীপ নিয়ে নত হয়ে প্রণাম করছেন—সেই গৃহকোণই তাকে যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে। প্রতি মুহূর্তগুলো যেন সৌম্যর কাছে অসহ্য হয়ে উঠছিল।

অবশেষে একদিন জাহাজ মাদ্রাজ বন্দরে এসে ভিড়লো।

সৌম্য জেটিতে পা দিয়েই সবিস্ময়ে দেখলো উজ্জ্বল ও প্রসন্ন মুখে অধ্যাপক রায় দাঁড়িয়ে আছেন। সৌম্য এতখানি আশা করেনি। অধ্যাপক রায় তাকে বুকের মাঝখানে জড়িয়ে ধরলেন—সংবাদপত্রের প্রতিনিধি ও ফটোগ্রাফারদের ভীড় জমে গেল। সৌম্য সপ্রতিভভাবে সংক্ষেপে তাদের প্রশ্নের জবাব দিল। তারপর ভারতীয় বৌদ্ধমহাসভার পক্ষ থেকে অনেকে এসে সৌম্যকে মাল্য ভূষিত করলেন।

তাকে নিয়ে এইসব অভ্যর্থনার ঘটা তার একটুও ভাল লাগছে না—বিড়ম্বনা ও লজ্জাবোধ দুই-ই হচ্ছিল।

অধ্যাপক রায় সরাসরি তাকে নিয়ে হোটেলে চলে গেলেন। রাতটুকু মাদ্রাজে কাটিয়ে পরের দিন প্লেনে কোলকাতা রওনা হলেন।

আবার সেই কোলকাতা।

সৌম্যর মনে হলো গ্রাম ছেড়ে একদিন কোলকাতা আসতে তার কী মন খারাপই না হয়েছিল। আজ কিন্তু কোলকাতাই তার মন টানছে।

প্লেন এসে নেমেছে তার জায়গায়। অধ্যাপক রায়ের সঙ্গে সৌম্য নেমে এলো। তারপর এরোড্রোম ছেড়ে বাইরে এলো। দু'চার পা এগিয়ে এসে সে যা দেখলো সেটা যেন বোরোবুদুরের চেয়ে বিস্ময়ের সৃষ্টি করলো তার মনে! সামনে দাঁড়িয়ে আছেন মা, মুখে স্মিতহাসি। তাঁর পাশে দীপু, নীরু আর কালু। মার কাছে এগিয়ে যেতেই মা তাকে বুকে চেপে ধরলেন—তারপর বললেন: তুমি দেখেছ কি, আমার চেয়েও তোমার জন্ম যাঁর আনন্দ হবে তিনি ফিরে এসেছেন!

সৌম্য মুখ তুলে তাকিয়ে যা দেখলো তাতে তার নিজের চোখকে বিশ্বা

করতে পারছিল না—এদের কাছাকাছি নির্মলবাবু বেশ সহজভাবে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছেন।

অধ্যাপক রায় বললেন : এই খবরটা তোমাকে দিইনি সৌম্য।

সৌম্য এগিয়ে এসে নির্মলবাবুকে প্রণাম করতেই তিনি তাকে ধরে তুলে বললেন : আমিও তাহলে একটা খবর দিই সৌম্য, তুমি আর দীপু, নীরু, কালু, সকলেই পাশ করেছ। তুমি এ বছরে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছ।

সৌম্য মাথা নত করে বললে : আপনিই আমার প্রেরণা স্বর, আপনার মত গুরু না পেলে আমি কিছুই করতে পারতাম না।

অধ্যাপক রায় তাড়া দিয়ে বললেন : এখানেই সব গল্প শেষ হয়ে যাবে যে! চলো সকলে বাড়ী চল।

অধ্যাপক রায়ের বাড়ীতে এসে পৌছান মাত্রই ভৃত্য এসে তাঁকে একটা শিল করা বড় খাম দিল। চিঠি খুলে তিনি পড়ে সেটা নির্মলবাবুর হাতে দিলেন। পড়তে পড়তে নির্মলবাবুর চোখ দু'টি আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠলো—তিনি বললেন : এতে কি লেখা আছে তা শোনাই—বুদ্ধের আড়াই হাজার মহাপরিনির্বাণ উপলক্ষে যে বিশ্ব বৌদ্ধ মহাসম্মেলন আহূত হয়েছে তাতে ভারত সরকার সৌম্যকে ভারতের প্রতিনিধি মনোনয়ন করেছেন আর অভিনন্দন জানিয়েছেন।

নির্মলবাবুর কথা শেষ হওয়ামাত্র সকলেই আনন্দোজ্জল দৃষ্টিতে সৌম্যর দিকে তাকালো।

নাটক
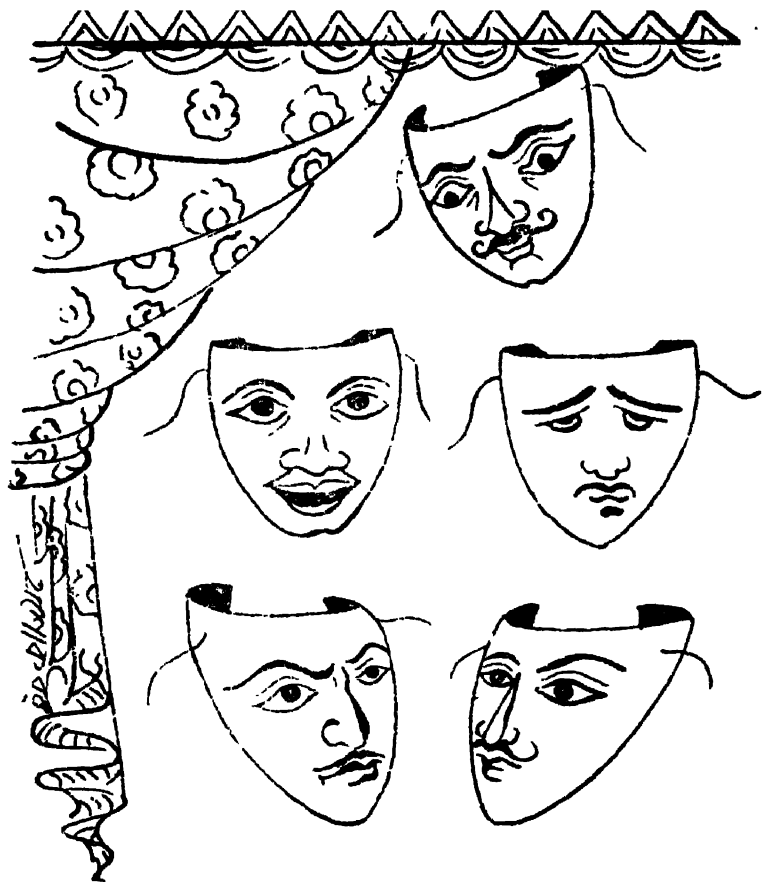
অথৈ জলে

[স্টেজ নীল কাপড় দিয়ে মোড়া হবে। নীল আলোর তরঙ্গ চলবে। মনে হবে নীল জলের নীচে নেমে এসেছি। দু'চারটে শ্যাওলা গাছ, ঝিনুক, শাঁখ গুগলী ছড়ানো থাকবে। আলো এমনভাবে ফেলতে হবে—মনে হবে ছোট ছোট ঢেউ ওঠা নামা করছে। জলের নীচে দুটো মাছ দু'দিক থেকে আসবে।]

[পোষাক : গলা থেকে পা পর্যন্ত আঁট সাঁট করে কাপড় পরা থাকবে। কাপড় কালোর উপর সাদা গোল গোল ছাপ হলেই ভাল হয়—যাকে রূপালী আঁশ লাগানো মনে হতে পারে। কড়ি ঝিনুকের গয়না, শাঁকের, পলার মালা। নাচ শেষ করে মাছ দু'টো চলে যাবার পর—কাতলাগিন্নীর প্রবেশ।]

গিন্নি : (ওদের চলে যাবার পথের দিকে চেয়ে) এ-বাড়ী ও-বাড়ীর বাচ্চার দল খুব হৈ-চৈ করছে। ঐ দিকটায় না যায়, বলবই বা কাকে ?

[বাচ্চুর প্রবেশ। বাচ্চু একটা ছোট মাছ]

বাচ্চু : ওমা মাগো, তুমি কোথায় ছিলে ? (হাত ধরে) ওমা! মা নয় ঠাকুমা! মা কোথায় ?

গিন্নি : মা কাজকর্ম করবে না ? খাবার দাবার যোগাড় করবে না—? কি দরকার আমায় বল। ক্ষিদে পেয়েছে ?

বাচ্চু : না ক্ষিদে পায়নি—এমনি জিজ্ঞাসা করছি। (ঢোঁক গিলে) ঠাকুমা, একটা গল্প বলো না।

গিন্নি : গল্প ?

বাচ্চু : হ্যাঁ ঠাকুমা—তুমি যদি গল্প বলো আমি ওদের ডেকে নিয়ে আসি—ঐ যে ওরা সব ওখানে খেলছে।

গিন্নি : কোন্ দিকটায় খেলছে বল তো ? ঐ দক্ষিণ দিকটায় না যায়, ওদের বলে দাও আর ডেকে নিয়ে এসো।

[বাচ্চু দৌড় দিল আর কাতলাগিন্নী নাকের নথ তুলে দোক্তা খেল, কানের গয়না ঠিক করলো, তারপর ভালো হয়ে বসলো। হাততালি দিতে দিতে একদল মাছসহ বাচ্চুর প্রবেশ।]

সকলে : হুররে হো, হুররে হো, ঠাকুমা গল্প বলবে—কি মজা !

গিন্নি : সব চুপ করে বসো দেখি যদি গল্প শুনবে। (দু' একজনকে ভালো করে দেখে) তুই—কে রে—কই খুড়োর নাতনী না ?

১ম : হ্যাঁ, দাদুর কাছে তোমার গল্প শুনেছি।

গিন্নি : তাতো শুনবেই—কি ভাবটাই না আমাদের কর্তার সঙ্গে ছিল !

বাচ্চু :—আর একে চেনো না ঠাকুমা, মৃগেল জ্যাঠার ভাইঝি।

গিন্নি : ওমা তাই নাকি, দেখি দেখি—ওর বাবাকে কত ছোট দেখেছি—ভাল আছে সব ?

২য় : হ্যাঁ ভালো আছে। আমরা এই নদীতে বেড়াতে এসেছিলাম কিনা তাই এখানে এলাম।

গিন্নি : আচ্ছা, মাকে বলিস্ আমার সঙ্গে একবার দেখা করতে। ওরা কে ? ও! বাবলু লালটু টুটুন ছট্টু এসব পোনা ছানাগুলোকে চিনি।

[বাচ্চা মাছগুলো খিল খিল করে হেসে এ ওর গায়ে ঢলে পড়লো]

বাচ্চু : তুমি কি গো ঠাকুমা ! দেখতে পাচ্ছ না ? (কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিসিয়ে) ও হলো কৈ ঠাক্রুণের নাতনী। তোমরা যে বলো, কৈ ঠাক্রুণের কাঁটার জ্বালায় অস্থির, কাছে দিয়ে গেলে সরে দাঁড়াতে হয়। ওরা আজ এসেছে বৌ কুণ্ডুর পুকুর থেকে—ওরা কেমন সুন্দর গান গায়—তাকে নাকি রবীন্দ্র সঙ্গীত বলে ? শুনবে তুমি ঠাকুমা ?

৩য় : আর আমরাও সমবেত সঙ্গীত গাইতে পারি। পৃথিবীর লোকেরা একসঙ্গে চেঁচায় তাকে বলে সমবেত সঙ্গীত। তুমি যদি শুনতে চাও ঠাকুমা, আমরা শোনাতে পারি।

গিন্নি : হ্যাঁ শুনবো, রবীন্দ্র সঙ্গীত না কি তাও শুনবো আর মানুষদের কাছে কি সমবেত সঙ্গীত শিখেছিস্ তাও শুনবো।

১ম : জানো ঠাকুমা আমরা যেদিকে থাকি—সেদিকে সন্ধ্যার সময় যদি ডাঙ্গার পানে যাও, আশে পাশের বাড়ী থেকে শুনতে পাবে কত গান হচ্ছে, কাঠের বাক্স থেকে গান বেরোয়—'

২য় : হিঃ হিঃ হিঃ ওমা! তাকে কি বলে জানিস্ না বুঝি? তাকে বলে রেডিও—রেডিও।

গিন্নি : ওঃ তোরা বুঝি ঐ সব শুনে শিখেছিস্? তোরা গান কর আমি শুনবো।

২য় : কিন্তু ঠাকুমা, মানুষগুলো।—

গিন্নি : তোরা তো কচি-বাচ্চা, মানুষের খবর তোরা কি জানবি বল? সে আমরা দেখেছি,—হাড়ে হাড়ে বুঝেছি ওদের অত্যাচার।

৩য় : কি করে ওরা ঠাকুমা।

২য় : আহা, তুই যেন কিছু শুনিস্ নি? মানুষগুলো মাছ ধরে আর টপাটপ খায়।

৩য় : (অবাক হয়ে হাঁ করে) য়ঁ্যা বলিস্ কি? ধরে আর খায়!

২য় : হ্যাঁ ধরবে, কুটবে, রাঁধবে, তারপর কপ কপ করে খাবে।

৩য় : (ভ্যাঁ করে কেঁদে) ওমা! আমার ভয় করছে, আমি মার কাছে যাবো।

২য় : (ধমক) আহা কেঁদে মরে গেলেন—এখানে কি মানুষ আছে নাকি?

গিন্নি : কাঁদতে হবে না। সব চুপ করে বোসো দিকি, ভয় নেই, আমরা তো আর ডাঙ্গায় বসে নেই।

[দুটি পুঁটি মাছ নাচতে নাচতে এলো]

২য় : কে গো তোমরা?

পুঁটিরা : হিঃ হিঃ হিঃ চিনতে পারলে না।

গিন্নি : তোরা চুনো পুঁটি না? তোরা আবার নাচগান শিখলি কবে?

পুঁটি : মানুষরা বলাবলি করে 'টাটকা চুনোপুঁটি খেতে খুব ভালো।'

[জিভ দিয়ে ঠোঁট চেটে নেয়]

২য় : আবার যদি সে মাছ ঝাল দিয়ে হয়!

সকলে : হোঃ হোঃ হোঃ।

পুঁটি : ও ঠাকুমা তুমি নাকি গল্প বলবে—তাই তো আমরা শুনতে এলাম—বলনা ঠাকুমা!

[কাতলা-গিন্নির কোলের উপর মাথা দিয়ে শুয়ে পড়লো]

বাচ্চু: (পুঁটিকে টেনে) তুই শুলি কেন, ওঠ না, ঠাকুমা তো আমার।

২য় পুঁ: তুই তো ভারী ঝগড়াটে হয়েছিস্, আমার তোমার করতে শিখেছিস্। শুয়েছে তো কি হয়েছে? ছোট ছোট ভাই-বোনেদের সঙ্গে ঝগড়া করতে হয় নাকি?

[বাচ্চু রেগে গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল]

গিন্নি: বাচ্চু, এখানে এসে বসো, রাগ করতে নেই। ওরা তোমার চেয়ে ছোট না? ঝগড়া করতে নেই, আচ্ছা সবাই বসো আমি গল্প বলি—

"আমি তখন খুব ছোট, এই চুনোপুঁটির মত। বেশ পড়ে মনে—মার কাছ থেকে পালিয়ে আসতাম। সাঁতার কেটে কেটে অনেক দূরে চলে যেতাম, এপাড়া-ওপাড়া ঘুরে কত কি দেখতাম। দেখে-শুনে খেয়ে-দেয়ে বাড়ী ফিরতাম। ফিরে দেখতাম মা খুব ভাবছে—কোনোদিন মা বকতো আবার কোনোদিন গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলতো এত দেরী কি করতে আছে, আমি ভেবে মরি। সেই থেকে ঘরবার করছি। স্থলচর জীবগুলোর যা অত্যাচার—এই তো ক'দিন আগে কাতলা বুড়োর বাচ্চাগুলো খেলতে গেল আর ফিরে এলো না। মানুষরা নাকি জাল পেতে রেখেছে, পরশু পোনার নতুন ছানাগুলো নাকি মানুষের গহ্বরে গেছে—একথা শুনে কারো ভরসা হয়! যখনই কোথাও যাবে দেরী করো না, আমি ভেবে সারা হই, মাছ-খেকোদের হাতে পড়লে কি আর রক্ষে আছে!

সকলে: তারপর! তারপর!

গিন্নি: মা বলতো এমনি হয়, তাই খুব সাবধান! মানুষের মত খল জাত আর নেই। মাছ না হলে ওদের একগ্রাস ভাত মুখে উঠবে না।

১ম: আমাদের খেয়ে ওদের কি লাভ?

২য়: বোকা দেখ, আমরা যেমন পোকামাকড় খাই—ওরা তেমনি মাছ খায়। মা এইকথা বলেছে আমায়।

গিন্নি: আর শোনো, যখন যেদিকে যেতে বারণ করা হবে, শুনবে। ভুল করে যদি না শোন, তাহলে প্রাণ দিতে হবে।

১ম: (চোখ পিটপিট করে) প্রাণ? প্রাণ কি ঠাকুমা?

গিন্নি: প্রাণ দেওয়া মানে মরে যাওয়া, মানুষরা ধরে খেয়ে ফেলেছে তাদের।

[পাখনাগুলো উঁচু করে সব মাছগুলো হেসে উঠলো।

সকলে : ওমা ! বড়দি এসেছে, বড়দি এসেছে। বলনা গো বড়দি মানুষগুলোর কাণ্ডকারখানা।

বড়দি : (সবদিক দেখে, বাচ্চুর গায়ে হাত দিয়ে) তোর জন্যই তো ভয় বাচ্চু, তোর বড্ড লোভ, তাছাড়া এত ঘুর ঘুর করে বেড়াস, যে সর্বদা মনে হয় দিল বুঝি মানুষে শেষ করে। আর ভয়-ডর কাকে বলে তা তো— তুই জানিস্ না।

সকলে : ওমা ! তাই বলে ভীতু হবো নাকি ?

বড়দি : ভীতু হবে কেন ? কিন্তু তা বলে শুধু শুধু জেনে শুনে বিপদের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়া বুঝি ভালো ?

বাচ্চু : তবে কি করবো ? আরে মৃগেল দাদু এসেছে ঠাকুমা, তোমার ভাসুর এসেছে।

[বড়দি, বাচ্চু আর সব মাছ গিয়ে মৃগেল দাদুকে প্রণাম করলে। ঠাকুমা মাথায় কাপড় দিয়ে উঠে চলে গেল। মৃগেল দাদু বড়দির মাথায় হাত দিল, ছোটদের আদর করলে]

মৃগেল : আর খেলাধূলা নয়—সব বাড়ী যাও—পালাও। জাল পড়েছে, জাল—আর কাছাকাছি পড়েছে, এদিকে থাকলে রক্ষে নেই। বড় হোক ছোট হোক মানুষের ভোজে যেতে হবে।

বড়দি : তার মানে কি দাদু, মাছধরার জাল ফেলেছে ওরা ? কোথায় ফেলেছে ?

মৃগেল : কোথায় তা পরে জেনো। এ জায়গা যে মোটেই নিরাপদ নয় তা কি বুঝতে পারছো না ? সবগুলো যাবে জালের মধ্যে। এই চুনোপুঁটি তোরা আবার এসেছিস্ কেন ?

পুঁটিরা : বেড়াতে এসেছি দাদামশাই—বেড়াতে এসেছি।

মৃগেল : তাহলে আজ আর যাওয়া হবে না। আজ থাকবে বাচ্চুদের বাড়ী—ঐ দিকেই মস্ত জাল ফেলা হয়েছে—যা, যা সব বাড়ী যা। (প্রস্থান)।

[কাতলাগিন্নির প্রবেশ]

গিন্নি : (হাঁপাতে হাঁপাতে) এই যে বড়, শীগ্গীর এই বাচ্চাগুলোকে নিয়ে এখান থেকে সরে পড়। জাল—জাল ফেলেছে মানুষেরা—আবার ঐদিকের নদীর বাঁকের মুখে ভালো ভালো খাবার দিয়ে মানুষেরা ছিপ ফেলেছে। রুই দাদার বাড়ী কান্নাকাটি করছে, কর্তা নাকি এখনও ফেরেনি।

পুঁটি : (হেসে লুটিয়ে) ওমা! ঐ রাক্ষসের মতো শরীর—ওকে আবার কে ধরবে?

২য় : আর ওজন? মানুষেরা ওকে ধরে বলবে একটা পাহাড় এনেছি।

১ম : রুই জ্যাঠাকে ধরতে পারলে তো? (কলা দেখিয়ে) এইটি! অত ওজন আর তুলতে হয় না। আমরা পাশ দিয়ে যাবার সময় কত সাবধানে যাই—না হলে চিঁড়ে চ্যাপ্টা হয়ে যাবো। আর মানুষেরা নাকি ধরবে, হুঁ!

গিন্নি : জ্যাঠামি করিস্‌নি। ওদের জাল কতবড় জানিস্? ওরা বলে ছিপেই কত বড় বড় মাছ ধরে।

বড়দি : কিন্তু ঠাকুমা—

ঠাকুমা : চুপ কর দেখিনি বড়, রুইদাদাকে পেলে ওদের বিয়ে-বাড়ীর ভোজ হয়ে যাবে, কিছু তো বুঝিস্ না তোরা, সাবধান করতে করতে গেলাম। যা সব বাড়ী যা। আমি দেখি ওদের বাড়ী—কি হলো।

[বাচ্চু আর পুঁটিরা ছাড়া সব চলে গেল]

বাচ্চু : (নিজের মনে) জাল আর ছিপ—এ দু'টো যে কি জিনিস দেখতে হবে। (ভাবতে ভাবতে চলে গেল)

পুঁটি : আজ তো আর বাড়ী যাওয়া হবে না, এখানেই থাকতে হবে। চল বাচ্চুদের বাড়ী যাই।

২য় : বড্ড গান গাইতে ইচ্ছা করছে কিন্তু—

[দু'জনে গান]

১ম : ওরে ও পুঁটি ভাই দেখনা চেয়ে
গভীর জলের তলেতে
সুতোর গায়ে ঝুলছে খাবার
চাস্ কি ও খাবার খেতে!

২য় : মরে যাই লোভ দেখে তোর
(তুই) আপন কাজে আপনি বিভোর
ও খাবার গিলিস্ নে ভাই
মানুষ আছে ওৎ পেতে।

১ম : পুঁটি তুই বেজায় বোকা
চিরকাল রইলি খোকা,
শিখে নে আমার কাছে
কি করে হয় টোপ খেতে।

২য় : কারো মানা শুনিস্ নে তুই
বেয়াদপ—পুঁচকে ও রুই
লোভে পাপ করিস্ নে ভাই
বলে যাই ঘরে যেতে

১ম : ও দাদা বাঁচাও মোরে
কে আমায় টানছে জোরে
প্রাণ গেল লোভের বশে
কাৎনার ঐ সঙ্কেতে।

২য় : লোভে পাপ করলে পরে
যেতে হবে যমের ঘরে
অকালে দুঃখ পাবি
সকলে শোন কান পেতে।
সুতোর ডগায় ঝুলছে খাবার
চাস্ কি ও খাবার খেতে! [প্রস্থান

[শোবার ঘর। বড়দি, মা আর বাচ্চু]

মা : তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড় বাচ্চু, আজ জলের মধ্যে বড় গোলমাল।

বাচ্চু : হ্যাঁ মা, রুই জ্যাঠা বাড়ী ফিরেছে?

মা : কই আর এলো, অনেক খোঁজাখুঁজি হলো। সেকি আর ফিরবে? মানুষগুলো আর একবার রুই দাদাকে ধরেছিল, তখন রুই দাদা এত বড় হয়নি। ডাঙ্গায় তুলে ওর পাখ্‌নায় একটা মাকড়ী লাগিয়ে দিয়ে বলেছিল, "যা এখন ছেড়ে দিলুম, আবার বড় হলে ধরে নেবো, মঞ্জুর যখন বিয়ে হবে।"

বাচ্চু : মঞ্জু কে মা?

মা : মানুষদের মেয়ে হবে! রুই দাদা যখন ফিরলো তখন রক্তে ভেসে যাচ্ছে। ডাক্তার ডাকা হলো, ওষুধপত্র করে তারপর সেরে গেল। এতখানি বয়স পর্যন্ত তাই রুই দাদা সাবধানে থাকতো, সবাই বলতো বুড়ো হয়ে রুই দাদার ভীমরতি হয়েছে। কিন্তু দেখ অত সাবধানে থেকেও—

বাচ্চু : হ্যাঁ মা জাল কি জিনিস, আর ছিপ তার মুখের বঁড়শী ?

মা : ষাট্ ষাট্ ওকথা বলতে নেই, অলক্ষুণে কথা সব। তোমার বাবা সেদিন গল্প করছিল না—মানুষেরা জাল ফেলে ভারী উৎপাত আরম্ভ করেছে।

বাচ্চু : (দু'হাতে মাকে জড়িয়ে) তাই তো জানতে চাইছি, বাবা তো কেবল বলবে এদিকে যেও না জালের নৌকা এসেছে। ওদিকে যেও না ছিপ ফেলেছে।

মা : ঠিকই তো বলেছেন। তোমরা যে এখন ছোট্ট, তাই গুরুজনদের কথা শুনতে হয়—না শুনলেই বিপদ হয়। আমি বলি শোন, ভালো ভালো মোটা-সোটা পোকা-মাকড় যেখানে দেখবে থির হয়ে আছে—সেখানে কখনও মুখ দিতে যেও না বা তাকে ধরতে যেও না, তাহলে বিপদ।

বাচ্চু : (ঠোঁট দিয়ে জিব চেটে) কিন্তু পোকা-মাকড় খেতে আমার যে বড্ড ভালো লাগে!

মা : সে তো জানি, কিন্তু পোকাটা ধরতে গেলেই বঁড়শীতে আটকে যেতে হয়। পোকা নিয়ে কি করে টুক করে পালিয়ে আসতে হয় তাতো শেখনি। কাজেই ওদিকে এখন লোভ করো না।

বড়দি : কাল আমি যখন বন্ধুর বাড়ী থেকে বেড়িয়ে ফিরছিলাম, দেখলাম মাথার উপর একটা চমৎকার মোটা-সোটা পোকা থির হয়ে আছে। ভাবলাম বাড়ী এনে ভাগ করে ভাইবোনেরা খাবো। ও মা! যেই না ধরতে যাবো দেখি—বঁড়শী দেখা যাচ্ছে—আর অমনি দৌড় দিয়েছি।

মা : তাই নাকি? কোথায়?

বাচ্চু : কোথায় রে দিদি—কোথায়?

বড়দি : ঐ যে রে যেখানে তোরা সকলে মিলে খেলা করিস্। ডাঙ্গা থেকে বেশী দূরে নয়—যেখানে মানুষেরা চান করতে আসে। কারা যেন একবার গয়না ফেলে গিয়েছিল।

বাচ্চু : ও জায়গা তো আমি জানি—পরশুও ওখানে আমরা খেলতে গিয়েছিলাম।

মা : চিনলে কি হবে। ওদিকে যেন যেও না। ভুলেও খেলতে যাবে না বুঝেছ বাচ্চু?

বাচ্চু : আচ্ছা মা, ওরা আমাদের ধরে নিয়ে গিয়ে কি করে?

মা : সে কথা আর কি বলবো?

বাচ্চু : কাল যে মৃগেল দাদু, ঠাকুমা সব বল্লে কাদের বাড়ী বিয়ে সেইজন্য রুই জ্যাঠাকে পাওয়া যাচ্ছে না। ওরা কি করবে ?

মা : ধরে নিয়ে গিয়ে মস্ত বড় বঁটি পেতে মায়া-দয়া না করে কাটতে আরম্ভ করবে।

বাচ্চু : বঁটি কি জিনিস মা ?

মা : তা দিয়ে কাটা হয়—মস্ত বঁটি পেতে ঝিয়েরা মাছ কোটে, তারপর ভাজা হয়, রান্না হয়, বিয়ে বাড়ীর ভোজ হয়। তুমি কিন্তু যেও না ওদিকে বুঝলে ?

বাচ্চু : আচ্ছা !

মা : অনেক রাত হয়েছে ঘুমোও এখন—বড় তুমিও শোও গে।

[আলো কমে যাবে, সকলে শুয়ে পড়বে। বাচ্চুর ঘুম ভালো হচ্ছে না। আধ ঘুম ঘোরে সে দেখছে যেন মৃগেল দাদু, ঠাকুমা এসে বলছে]

মৃগেল : কেউ ওদিকে যাবে না, মানুষেরা জাল ফেলেছে।

ঠাকুমা : বাড়ী যাও সব, এদিকে ভারী বিপদ, রুই দাদাকে পাওয়া যাচ্ছে না।

বাচ্চু : ছিপ আর জাল এ দুটো কি জিনিস দেখতে হবে। মা বলেছে ধরতে যদি পারে তাহলে মস্ত বড় বঁটি পেতে কেটে খণ্ড খণ্ড করবে। আমি যাবো দেখবো, মোটা-সোটা পোকাটাকে নিয়ে দৌড়ে পালিয়ে আসবো। আমার ক্ষমতা দেখে ঠাকুমা, মৃগেল দাদু অবাক হবে—সেই মোটা-সোটা পোকাটা (জিব চেটে) আঃ !

[আলো বড় হবে, বাচ্চু ধীরে ধীরে উঠে বসবে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মায়ের দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে যেতে যেতে]

বাচ্চু : কিন্তু মা বলেছিল 'ওদিকে যেন লোভ করো না,—কিন্তু সেই মোটা-সোটা পোকাটা—(প্রস্থান)

[একটু পরে ঠাকুমার প্রবেশ]

ঠাকুমা : ও বৌ ঘুমুচ্ছো নাকি, ছেলে-পিলে ছানাপোনা সব ঠিক আছে তো ? মানুষেরা যে হৈ চৈ করছে, ওদের বঁড়শীতে কচি মাছ উঠেছে আর জালে উঠেছে মস্ত রুই—দেখ দেখ সব গুণতি করে—আমি ও-বাড়ী খবর নিই। [প্রস্থান]

মা : (চারিদিকে তাকিয়ে) বাচ্চু কই ? বাচ্চু ! বাচ্চু !

বড়দি : (ঘুম ভেঙে) এ্যাঁ কি হয়েছে?

মা : বাচ্চু। বাচ্চু কই? বাচ্চু! বাচ্চু!! বাচ্চু!!!

[প্রস্থান]

[ডাঙায়]

[বিয়ে বাড়ী—একদিকে বরকনে বসে আছে, সকলে এসে বরকনে দেখে উপহার দিয়ে চলে যাচ্ছে। আবার একদিকে গান-বাজনা হচ্ছে। আর একদিকে লোকজন খেতে বসেছে। অন্দর মহলের উঠানে বড় বড় মাছ পড়ে আছে। ঝিয়েরা বঁটি পেতে সেই মাছ কুটছে। এই মাছের মধ্যে রুই জ্যাঠা আর বাচ্চু আছে।]

ঝি : বাবাঃ এত বড় মাছের সঙ্গে আবার এটা এলো কোথা থেকে। এ মাছ তো জালে পড়ে না।

খোকা : ও মা কি সুন্দর বাচ্চা মাছ! ও ঝি-দিদি, ওটা কেটে দাও—আমি খাবো।

খুকী : খোকন, বলেছি না ওরকম করো না, যখন রান্না হবে—তখন খাবে। মা কি বলেছেন মনে নেই? মার কথা না শুনলে কি হবে জানো?

খোকা : কি আবার হবে—মাছ হয়ে যাবো? ঐ ছোট্ট মাছটার মত।

খুকী : কি হবে? দুষ্টুমী করে মার কথা না শুনলে কি হয় জানো না?

[এবার লাইট ঘুরিয়ে নিয়ে অন্য সবদিক অন্ধকার করে মাছগুলোর ওপর ফেলা হবে। রুই জ্যাঠা খাবি খাচ্ছে আর বাচ্চু নিস্তেজ হয়ে পড়ে আছে। অন্য মাছগুলোও গাদা হয়ে আছে।]

গল্প

ওই সিংহল দ্বীপ

দক্ষিণ ভারতের এক নিবিড় ঘন বন—তারই পাশ দিয়ে চলা সরু পথ। সেই পথ ধরে চলেছে একজন যাত্রী—সঙ্গে ছোট দুটি ছেলে আর মা। তাদের মা আর রক্ষী দল। ছেলেটি বছর তিনেক—মেয়েটি খুব ছোট—মার কোলে বসে আছে—ছেলে মেয়ে মা পাল্কিতে—বাহক সঙ্গী জনকয়েক।

রক্ষীদের প্রধান বললেন—হুঁসিয়ার হয়ে চলো ভাই—এ জায়গাটা ভালো নয়—অনেক দেরী করে যাত্রা করেছি আমরা। আরও আগে এই বিপদজনক এলাকা পেরিয়ে এলেই হতো ভালো। তার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই বন কাঁপিয়ে উঠলো বিরাট গর্জন, একেবারে সিংহনাদ। সব ছুটে পালালো দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে। মা মেয়ে আর ছেলের কি হলো—কেউ খোঁজ নিতে এগিয়ে এলো না—পশুরাজের কিন্তু দয়া হলো—তাদের আক্রমণ তো করলই না—বরং পথ দেখিয়ে তাদের নিয়ে গেল তার গুহায়।

মা ভেবেছিলেন কেউ-না-কেউ খোঁজ করতে আসবে—যাচ্ছিলেন তো বাপের বাড়ী। বাবা বৃদ্ধ। কিন্তু ভায়েরা তো খোঁজ করতে আসবে? শ্বশুর কুল! কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা, দিন যায়, রাত কাটে, সপ্তাহ গড়িয়ে মাস আসে, মাসের পর বছর! সিংহই তাদের খাবার জুটিয়ে আনে। অন্য জন্তু-জানোয়ারের আক্রমণ থেকে বাঁচিয়ে রাখে। ছেলেটা বড় হয়েছে—বুঝতে পারে। মাকে বলে—এ কী রকম জীবন মা? এমনি ভাবেই কাটাতে হবে এই জানোয়ারের রাজ্যে। মা কিছু বলেন না—শুধু ওপরের দিকে তাকান দু'চোখ মেলে। পশুরাজ কথা বলতে পারে না। কিন্তু মনের ভাব বুঝতে পারে। তার ইচ্ছে ছেলেটা এবার তার সঙ্গে শিকারে বার হয়—ছেলে তাতে রাজী। পথ-ঘাট তো চেনা যাবে, তারপর মা আর বোনকে নিয়ে একদিন বন থেকে বাইরে যেতে পারবে—নির্বাসনের মেয়াদ তখনই শেষ হবে। হলোও

তাই। সিংহ সেদিন একাই বেরিয়েছে অনেক দূরের পাল্লা। ছেলে বললে,—শীগ্‌গির এসো। বোনকে তুলে নিল কোলে। তারপর শুরু হলো ছোটা আর ছোটা। শেষ পর্যন্ত মানুষের রাজ্যে এসে পৌছুলো তারা।

পশুরাজ গুহায় ফিরে এসে ব্যাপার দেখে তাজ্জব। অনেক খোঁজাখুঁজি করে না পেয়ে রাগে ফুলে উঠলো কেশর, তার গর্জনে কেঁপে উঠলো বন—পশু-পাখীরা ভয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে ঢুকলো। পশু হলে কী হবে! এতদিন মানুষের সংশ্রবে থেকে বুদ্ধিশুদ্ধি কিছুটা আয়ত্ত হয় তার। তাই এবার বন ছেড়ে খোঁজ করতে গেলো সহরে। কাছাকাছি জনপদে তাদের পাওয়া গেল না বটে, কিন্তু দু'চার দশজন তার হাতে প্রাণ দিতে লাগলো। আশে-পাশে সর্বত্র নেমে এলো গভীর আতঙ্কের ছায়া। শেষকালে যে সহরে এরা আশ্রয় নিয়েছিল সেখানেও শুরু হলো সিংহের অত্যাচার। দেশের রাজা হুকুম জারী করলেন—এ অত্যাচার বন্ধ করতে হবে—পুরস্কার দেওয়া হবে যে সিংহকে হত্যা করে রাজ্যের নিরাপত্তা ফিরিয়ে আনতে পারবে তাকে।

ছেলেটা এখন বড়সড় হয়েছে—বনে জঙ্গলে থেকে খুব কষ্টসহিষ্ণু। পাথরে গড়া দেহ, বুকে অদম্য সাহস। মাকে বললো,—মা তুমি অনুমতি দাও আমি যাবো।

মা বললেন,—এত দুঃখকষ্ট ভোগের পর শান্তি পেলাম, মা বাপ কেউ আর বেঁচে নেই, শ্বশুর বাড়ীর লোকেরাও আমাকে গ্রহণ করতে রাজী নয়। তুমিই এ দুঃখিনীর একমাত্র ভরসা। কী করে তোমাকে এ বিপদের মুখে যেতে বলি!

ছেলে অনেক বুঝিয়ে বলল মাকে। শেষ পর্যন্ত মা রাজী হলেন। হাতে ভোজালি নিয়ে ছেলে রওনা হলো—গ্রামের শেষ প্রান্তে এসে সবাই তাকে জানিয়ে গেল শুভেচ্ছা। গ্রাম ছেড়ে বনে ঢুকলো—হঠাৎ শোনা গেল বন-কাঁপানো বিকট আওয়াজ, গাছের আড়াল থেকে বোধহয় বেরিয়ে এলো প্রকাণ্ড সিংহমূর্তি। কিন্তু কী আশ্চর্য ছেলেটাকে দেখে সিংহ একেবারে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেল—কিছুক্ষণ পর এক পা এক পা করে এগিয়ে এসে ছেলেটির কাছে ঘেঁসে দাঁড়ালো। জিভ দিয়ে চাটতে লাগলো তার গায়ের ঘাম। গভীর করুণা মাখানো দুটি কাতর চোখের দৃষ্টি বুলিয়ে নিল ছেলেটির সর্ব দেহে। আর ছেলেটি তখন তার অস্ত্র দিয়ে প্রচণ্ড আঘাত করলো সিংহের দেহে। তবু নিশ্চল নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো পশুরাজ। নির্দয় নিষ্ঠুর

আঘাতের পর আঘাতে জর্জরিত হয়ে উঠলো তার দেহ, তব্ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত কোন প্রতি-আক্রমণের চেষ্টাই করলো না সিংহ, বিরাট দেহ তার লুটিয়ে পড়লো রক্ত-ঝরা মাটির কোলে।

বিজয়গর্বে ফিরে এলো ছেলেটা। রাজা তাকে পুরস্কার দিলেন। দেশবাসী সবাই তাকে ধন্য ধন্য করতে লাগলো। কিন্তু সুখী হন নি তার মা। হাজার হোক আশ্রয়দাতা তো বটে, স্বভাবে হিংস্র হয়েও একদিন তো পশুরাজ তাদের প্রাণ রক্ষা করেছিল। দিনের পর দিন আহার আর আশ্রয় জুগিয়ে তাদের নিরাপদে রেখেছিল। সেই আশ্রয়দাতার জীবন নাশ—এ যে অধর্ম। কিছু দিনের মধ্যেই মারা গেলেন মা।

কথাটা রাজার কানে গেল। ছেলেটাকে ডেকে পাঠাতে সে সব কথা অকপটে স্বীকার করলো। রাজা বললেন,—তোমাকে পুরস্কৃত করেছি বটে কিন্তু আশ্রয়দাতার জীবন নাশ করে তুমি অধর্ম করেছ। তাই তোমাকে আমার রাজ্য থেকে নির্বাসিত করলাম। মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করে একখানি নৌকায় তুলে তাকে ভাসিয়ে দেওয়া হলো জলে। অজানা সমুদ্রের বুকে ভেসে চললো ঢেউ-এর দোলায় ছোটো সেই নৌকা—নীল জল আর জল। যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু জল আর জল--কে জানে কিনারা পাওয়া যাবে কিনা? কখন এলোমেলো বাতাসে ভেঙ্গে যায় হাল? কখন ঢেউ-এর তলায় তলিয়ে যায় কাণ্ডারীশুদ্ধ নৌকা?

তবু শেষ পর্যন্ত কূল পাওয়া গেল।

ছেলেটা ভগবানের নাম স্মরণ করে নামলো অজানা দ্বীপে। সেখানকার অধিবাসীরা খুঁজছিল সুদক্ষ নির্ভরযোগ্য সাহসী নেতা। এই অজানা, নাম-না-জানা ছেলেটাই একদিন হয়ে গেল তাদের নেতা, দেশের রাজা, তার নাম কেউ জানে না—কিন্তু তার হাতে গড়া এই রাজ্যের নতুন নাম হলো সিংহল। সিংহের আশ্রিত সিংহের হননকারী রাজার নতুন রাজ্য পরিচিত হলো সিংহল নামে।

সিংহল নামকরণের কারণ সম্পর্কে অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে—আমরা যে কাহিনী বর্ণনা করলাম সেটা চীনের পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙের কাছ থেকে শোনা—তাঁর ভারত ভ্রমণের ইতিবৃত্তে এ কাহিনীটির উল্লেখ রয়েছে।
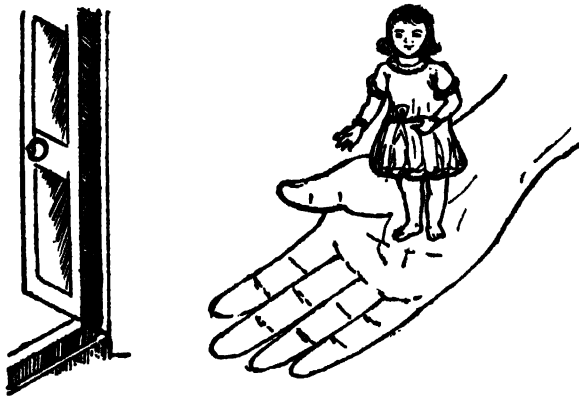
ভাগ্যের দেশে

—আমার ভাগ্যটা সব সময় খারাপ! গিন্নীপনার সুরে একথা বলে রুণু একটা মস্ত নিঃশ্বাস ফেললো।

নিজের ঘরে খেলবার জায়গাটিতে বসে রুণু একথা বলে মায়ের শোবার ঘরের দিকে একবার তাকিয়ে নিলে—দরজায় ভারী পর্দা ঝুলছে। মা ভিতরে আছেন কি না দেখা গেল না।

রুণুর খেলাঘরে অনেকরকম পুতুল খেলনার মেলা। একজোড়া জাপানী ছেলেমেয়ে সেজেগুজে চুলে রিবন বেঁধে অঘোরে ঘুমুচ্ছে। তারপরেই আছে একটা আলমারী। পুতুল ছেলেমেয়ের জামা কাপড়ে ভর্তি। তার পাশে একটু ডানদিক ঘেঁষে পেস্ট বোর্ডের প্রকাণ্ড বাড়ী। তার ঘরগুলিতে পর্দা লাগানো—ভিতরে দেশী বিলাতী অনেকরকম ছেলেমেয়ে। বাড়ীর সামনের বারান্দায় চারটে চেয়ার আর একটা টেবিল রাখা—এখানে রুণুর ছেলেমেয়েরা চা খায়, গল্পগুজব করে। তারপর আর একটু এগিয়ে এসো, এখানে আছে রান্নার সরঞ্জাম। রথের মেলা থেকে দিদিমার উপহার, কাশী ফেরৎ ছোট ঠাকুমার দেওয়া পিতলের একরাশি বাসন, এমনি কত কী যে তা বলার

কথা নয়। আর ঘর থেকে বেরিয়ে এলেই দেখা যাবে একটা বড় খাঁচায় ঝুলছে চমৎকার একটা ময়না। যাকে এনেছিল পুরান চাকর হরি। রুণুর মায়ের দেখাদেখি ময়না কেবল একটা কথা শিখেছে, কি হচ্ছে রুণু?

ময়নার উল্টোদিকে আছে একরাশ কাঠের ও ভেলভেটের জীবজন্তু—ঘোড়া, হাতি, বাঁদর, ভল্লুক, খরগোস, ভেড়া, ছাগল ইত্যাদি।

রুণুর সবচেয়ে প্রিয় হচ্ছে সেলুলয়েডের ডলটা। সেবার দিদি শ্বশুরবাড়ী থেকে এসে কী সুন্দর করেই না সাজিয়ে দিয়েছিল, গা ভর্তি পুঁতির গয়না, মাথায় কালো কোঁকড়ানো চুল। হঠাৎ কেমন করে এই ডলের মুণ্ডু ভেঙে গেছে। তাকে জোড়া লাগাবার কোনো উপায় খুঁজে না পেয়ে রুণু অসহিষ্ণু হয়ে বলে উঠলো :

—আমার ভাগ্যটা সব সময় খারাপ।

—কি হচ্ছে রুণু? ময়নাটা বলে উঠলো।

—বেশী বকবক করিসনি। আমার ভাগ্যটা সব সময় খারাপ।

রুণু মুখ তুলে তার সামনেই নীচে নামবার সিঁড়িটার দিকে তাকালো। কাঠের রেলিং চক্‌চকে পালিশ আর সিঁড়ির উপর কার্পেট মোড়া, সিঁড়ির বাঁকে বাঁকে বড় বড় পিতলের ফুলদানী। রুণু বলে উঠলো—এই সিঁড়িগুলো যদি না থাকতো—তাহলে আমার মেয়ে কী পড়ে যেতো, না মাথা ভাঙতো—এই হতভাগা সিঁড়ি, বাঁদর সিঁড়ি, এগুলো যদি না থাকতো—বলতে বলতে রুণু আবার সিঁড়ির দিকে তাকালো। কিন্তু ওকি! সিঁড়িটা তো নেই। রুণুর চোখ কপালে উঠবার যোগাড়। এ্যাঁ, একি কাণ্ড! সিঁড়ি! সিঁড়িটা গেল কোথায়? কি অসম্ভব কাণ্ড! রুণু পায়ে পায়ে এগিয়ে এলো। সত্যিই তো সিঁড়িটা নেই! উপর থেকে নীচে কুড়ি ফিট—যেখানে সিঁড়িটা শেষ হয়েছিল, সেখানে কার্পেট মোড়া জায়গাটা আর মস্ত বড় পিতলের ফুলদানীটা দেখা যাচ্ছে।

একলাফ দিয়ে নীচে পড়া ছাড়া সেখানে পৌঁছাবার কোনো উপায়ই নেই।

দিনের বেলায় এ কি কাণ্ড রে বাবা—রুণু ভয়ে ভয়ে বলছে। তার মুখটা বিবর্ণ হয়ে গেছে।

আবার রুণু তার জায়গায় গিয়ে বসলো। পুতুল-মেয়েকে দু'হাতে তুলে ঝাঁকানী দিয়ে বললে: যত দোষ তোর, পাজী মেয়ে, কেন সিঁড়ির কাছে দিয়ে পড়লে—না হলে তো এমন হতো না। তোমার জন্তে আমার,

এমন হচ্ছে—পৃথিবীতে যদি কোনো পুতুল না থাকতো সেই সবচেয়ে ভালো হতো।

রুণুর মুখের কথা শেষ হওয়ামাত্র কে যেন তার হাত থেকে পুতুলমেয়েকে ছিনিয়ে নিলো। মাথা ভাঙা পুতুল তার হাত থেকে অদৃশ্য হলো, কিন্তু কে যে নিলো তা দেখা গেল না।

—ওমা! ওমা এ আবার কি? কে এমন করেছে? ভয়ে রুণুর ঠোঁট দুটো নীল হয়ে গেছে। পা দুটো কাঁপছে। রুণু নিজের খেলাঘরে ঢুকে দেখতে লাগলো তার অন্য পুতুল ছেলেমেয়ে আছে কি না।

হায়! হায়! একটিও যে নেই। সব বিছানা খালি। চেয়ার খালি, সোফা খালি, কোনো পুতুল ছেলেমেয়ে নেই। রুণু এবার মরিয়া হয়ে ঢুকে পড়লো মায়ের শোবার ঘরের মধ্যে! যে ছোট খাটখানিতে সে শোয় তার পাশেই বালিশ দেয়া—চোখ বোজা সিল্কের ফ্রক পরা মস্ত বিলাতী মেয়ে ছিল—সে আছে তো? কই? না নেই তো, বালিশটা পড়ে আছে শুধু।

ইস্ কি কাণ্ড! ওটা যে বাবা জন্মদিনে এনে দিয়েছিলেন। ও যে আমার সঙ্গে থাকতো, ঘুমুতো—তাহলে? আচ্ছা, মেয়েকে খেলার ঘরে আনিনি তো? যাই দেখি।

ব্যস্ত হয়ে রুণু খেলার ঘরে ঢুকতে যাবে—ময়নাটা বলে উঠলো—কি হচ্ছে রুণু?

রুণু একবার জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ে সব জিনিস তন্ন তন্ন করে খুঁজতে লাগলো—নাঃ, কোথাও তার মেয়ে নেই। শুধু তাই নয়, সব ছেলেমেয়েই তার অন্তর্ধান হয়েছে।

আমি যা বলবো তাই হবে? আশ্চর্য! এ আবার কি! আচ্ছা তাহলে আমি বলছি! এখনি এখানে অ-নে-ক টাকা আসুক যা দিয়ে আমি এক্ষুনি বাজারে গিয়ে ভালো ভালো পুতুল আনতে পারি।

কিন্তু এবার আর কিছু হলো না। রুণু যেমন বসেছিল তেমনি রইলো—কেউ নেই।

রুণু ভয় পেয়ে চীৎকার করে উঠলো! মা! ওমা!! মা!! মা কাছাকাছি কোথাও ছিলেন না, তাই উত্তরও পাওয়া গেল না।

—কি হচ্ছে রুণু! ময়নাটা আবার বলে উঠলো।

এতক্ষণে রুণুর একটু সাহস হয়েছে। ময়নাটা তাহলে আছে। সবটাই ভৌতিক কাণ্ড নয়। আর একবার ভালো করে চারিদিকে তাকিয়ে নিজের মনে বলে উঠলো—এখানে সব খারাপ। এখানে আছি বলেই আমার ভাগ্য সব সময় মন্দ। আমি এমন জায়গাতে যেতে চাই—যা চাইবো তাই পাবো, তাহলে বেশ ভাল হয়।

—বেশ আমার সঙ্গে এসো, আমি তোমায় ভাগ্যের দেশে নিয়ে যাবো।

রুণুর উত্তর দেবার আগেই একটা বলিষ্ঠ ঠাণ্ডা হাত রুণুকে মাটি থেকে তুলে নিলো।

নাঃ, নেহাৎই বিপদের কথা, যা বলছে তাই—রুণু ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলো, "আহা দাঁড়াও, আমি মাকে বলে আসি। মাকে না বলে কেমন করে যাবো, দাঁড়াও, দাঁড়াও।" কিন্তু বেচারী রুণু, কেউ তার কথা শুনলো না। সেই বলিষ্ঠ হাত তাকে তুলে নিয়ে আস্তে আস্তে কেমন বেরিয়ে এলো। আসবার পথে রুণু দেখলে, বাইরের ঘরে বাবার কাছে কত লোক এসেছে। কথাবার্তা বলছে, দূরে বাগানের কাছে মালী দাঁড়িয়ে আছে। ফটকের পাশে জংবাহাদুর খৈনি মুখে দিয়ে ঝিমুচ্ছে। এরা কেউ রুণুকে দেখতে পাচ্ছে না? কি আশ্চর্য।

সেই ঠাণ্ডা হাতের ভিতর বন্ধ হয়ে, সব ফেলে রুণু আসতে লাগলো।

অবশেষে একটা ছোট বাড়ীর কাঠের দরজার কাছে রুণুকে নামিয়ে দিলে। দরজার সামনে তিনখানা বড় বড় পাথর রয়েছে। দরজায় উঠতে গেলে এই তিনটা পার হতে হবে। অথচ একটা থেকে আর একটায় যেতে বেশ কষ্ট স্বীকার করতে হবে। লাফ না দিলে একটা থেকে আর একটায় যাওয়া যায় না।

—বেশ তুমি এখানে আমায় নিয়ে এলে—অদৃশ্য হাতকে লক্ষ্য করে রুণু বেশ জোর গলায় বলে উঠলো।

—হ্যাঁ এনেছি তো! এটা কি জানো? এটা হচ্ছে ভাগ্যের বাড়ী। আচ্ছা তুমি এখানে থাকো—আমি যাই। অদৃশ্য কণ্ঠস্বর বলে উঠলো।

—না, না। তুমি যেও না, আমি বাড়ী ফিরবার রাস্তা জানি না। তুমি আমায় বাড়ী পৌঁছে দাও লক্ষ্মীটি!

—না রুণু তা হয় না। আচ্ছা আমি তাহলে—

রুণু আর কিছু বলবার অবসর পেলো না—কণ্ঠস্বর আর শোনা গেল না।

এইবার রুণু মহা ভাবনায় পড়লো—কি করা যায়। বাড়ীতে ফিরবারই বা উপায় কি? কিন্তু এখানেই বসে কি করবে? কেনই বা সে বলেছিল এত কথা। আচ্ছা বিপদেই এখন পড়া গেছে।

অগত্যা রুণু উঠলো—বন্ধ দরজায় দু'চারবার ধাক্কা দিলো। এখন সাহস না করলেই বা উপায় কি—দেখা যাক কি হয়।

—কে আছ দরজা খোলো। আমি আর এখানে দাঁড়াতে পাচ্ছি না। রুণুর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই দরজা খুলে বেরিয়ে এলো সৌম্য চেহারার এক বৃদ্ধ। ভারী সুন্দর তার চেহারা, সবচেয়ে আকর্ষণীয় হচ্ছে তার সাদা ধবধবে দাড়ি। মিষ্টি হাসি হেসে সে জিজ্ঞাসা করলেঃ কি চাই ভাই তোমার? কে তুমি?

প্রথমটা রুণুর একটু অভিনব লাগলেও বৃদ্ধের মিষ্টি কথা শুনে সে খুসী হয়ে উঠলো—কেমন বন্ধুর মত কথা বলছে—ভাবলো।

—কই বললে না, কি নাম তোমার?

এবার রুণু সহজ গলায় বললেঃ রুণু চৌধুরী।

—আচ্ছা, বেশ, বেশ—এসো আমার সঙ্গে।

রুণু যায় কেমন করে? সেই পাথরগুলো টপকানো বেশ শক্ত ব্যাপার যে। তাহলে?

তবু রুণু চেষ্টা করতে যাবার আগে বৃদ্ধের মুখের দিকে তাকালো। বৃদ্ধ বললেঃ এসো রুণু আমাদের বাড়ীর ভিতর। আমার আর দুই ভাই সেখানে আছে। আলাপ করিয়ে দেবো। তোমার নাম রুণু। বেশ মিষ্টি নাম। আমার নাম সৌভাগ্য। আর আমার অন্য দুই ভাই, এদের নাম—পরম-সৌভাগ্য। আর মন্দভাগ্য। এসো তুমি!

রুণু বাধা দিয়ে বললেঃ আমারও বোন আছে তার নাম ঝুনু, কিন্তু আমি যাবো কেমন করে? এই কথা বলেই সে যেই পাথর টপকাতে যাবে অমনি সে পড়ে গেল, আর হাঁটুতে বেশ ব্যথা পেলো।

তাড়াতাড়ি উঠে রুণু হাত বাড়িয়ে দিলো—বৃদ্ধ হাসি-মুখে তাকে সাহায্য করলে।

ভিতরে ঢুকতে ঢুকতে রুণু বললেঃ বাবা, পায়ে যা লেগেছে, একটা নয় তিনটে পাথর, এখানে সবই মন্দ।

—হ্যাঁ, এখানে সবই মন্দ! তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর শুনে রুণু মুখ তুলে তাকিয়ে

দেখলো একটা ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে আর একজন বৃদ্ধ। ঠিক প্রথম লোকটির মত। কেবল প্রভেদ হচ্ছে—ওর মত মুখটা মিষ্টি নয়। বন্ধু বলে মনে হয় না। সৌভাগ্য রুণুকে বললে: রুণু এই আমার ভাই। এর নাম মন্দভাগ্য! এ মনে ভাবে যা করতে যায় তাই খারাপ হয়ে যায়।

রুণু তার ব্যথা পা'টায় আর একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে মন্দভাগ্যের দিকে তাকিয়ে কিছু বলার আগেই সে বলে উঠলো: তুমি কি যে বলো। আজ যখন চা খাচ্ছি, দেখি আমার হাতঘড়ি নেই, ঘরে গিয়ে খুঁজলাম—কোথায় কি? আমার ভাগ্যটা সব সময়ই খারাপ।

রুণু দেখলো তারা যে ঘরের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে সেই ঘরে ঠিক প্রথম জনের মত সুন্দর ও সুশ্রী চেহারার একজন বৃদ্ধ। রুণু ভাবলো, একই রকম চেহারা হয় নাকি এদের? তবে এর চেহারা কেমন শান্ত। কি যেন লিখছে ধীর স্থির হয়ে। রুণু চুপ করে আছে দেখে সৌভাগ্য বললে: রুণু, এই হচ্ছে আমার আর এক ভাই পরম-সৌভাগ্য।

—ওঃ নমস্কার! নমস্কার!! রুণু তোতলামী করে বলে উঠলো।

—আমার ভাগ্য আমি তৈরী করি, তাই সব সময় ভালো।

—তুমি নিজের ভাগ্য নিজে তৈরী করো, সে আবার কি?

রুণুর তো চোখ কপালে উঠবার যোগাড়—এরা বলে কি?

—কেন বিশ্বাস হয় না? পরম-সৌভাগ্য একটু হেসে বললে।

—তাহলে আমারও তৈরী করে দাও না—দেখছো তো—রুণুর কথা মাঝ পথেই থেমে গেল।

—হোঃ হোঃ হোঃ—সৌভাগ্যের হাসি।

—হুঃ হুঃ হুঃ—মন্দভাগ্যের চাপা হাসি।

—হাঃ হাঃ হাঃ—পরম-সৌভাগ্যের উচ্চ হাসি।

রুণুর চোখে বিস্ময়—এ কি ব্যাপার?

পরম-সৌভাগ্য বললে, রুণুমণি তা হয় না। সৌভাগ্যও তার ভাগ্য তৈরী করে—কিন্তু আমরা অন্যের তৈরী করতে পারি না। সৌভাগ্যও সব সময় খুসী থাকে, ও কখনও ভাবে না আমার আরো ভালো হলে ভাল হতো, কিন্তু আমার ঐ ভাই মন্দভাগ্য। ও সম্পূর্ণ আলাদা—সব সময় মনে করে ও যা চাইছে তা পাচ্ছে না, ওর সব খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

—হ্যাঁ, ও ভাবে এই শহরটাই অন্য লোকে নিয়ে নিচ্ছে—সৌভাগ্য বললে।

—কি সব বাজে কথা বলো যে! রাগে গর গর করে মন্দভাগ্য বলে উঠলো।

—আচ্ছা, আচ্ছা, সবই শুনবে রুণু, এসো এদিকে বোসো—সৌভাগ্য রুণুকে বললে।

রুণু আর একবার ভালো করে পরম-সৌভাগ্যের দিকে তাকালো। অন্য দুই ভাই-এর চাইতে পরম-সৌভাগ্যই বেশী সুশ্রী। কেমন বলিষ্ঠ চেহারা, পরিশ্রম করার ক্ষমতা যেন অসাধারণ, চোখ দু'টিতে বুদ্ধির দীপ্তি, আর সমস্ত মুখটায় শিশুর মত সরলতা মাখা।

—আমার দিকে কি দেখছো রুণু? আমার স্বাস্থ্য দেখছো? আমার অসুখ করে না, খুব পরিশ্রম করতে পারি, অনেক উপার্জন করি এবং টাকা জমাই। স্বাস্থ্য শক্তি আর অর্থ আমার সবই আছে। আমার এই ভাইও স্বাস্থ্যবান আর ও সব-তাতেই সন্তুষ্ট থাকে। তাতেই ও খুশী, কি ভাই সৌভাগ্য?

—নিশ্চয়! আমার যা আছে আমি তাই যথেষ্ট মনে করি।

—যত সব বিচ্ছিরি গল্প, কে যে শোনে ওসব? মুখ বেঁকিয়ে মন্দভাগ্য বলে উঠলো।

—তা তো হলো, কিন্তু আমার ভাই বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে। তুমি তো গল্প করছো দাদা। এদিকে খাবার সময় হয়েছে—এই বলে সৌভাগ্য পরম-সৌভাগ্যের দিকে তাকালো।

—বেশ তো, খাবার ব্যবস্থা করো। রুণু আজ আমাদের অতিথি। আজ কার উপর খাবারের ব্যবস্থার ভার? পরম সৌভাগ্য জিজ্ঞাসা করলে।

—আমারই। এখন তো আমার উপরই রয়েছে এসব।

রুণু এতক্ষণ অবাক হয়ে শুনছিল।

সৌভাগ্য বললে: এসো রুণু, অবাক হয়ে যাচ্ছ যে! এসো আমাদের সঙ্গে আজ খাবে।

—আজ বুঝি তুমি খেতে দেবে? রুণু জিজ্ঞাসা করলে।

—হ্যাঁ, আমি খাবার-দাবার ঠিক করছি, কারণ আমার ছোট ভাই এসব দেখতে পারে না, আর দেখতে গেলে সব খারাপ করে ফেলে। আমার বড় ভাই টাকাকড়ি হিসেব-পত্র সব দেখা-শোনা করে। বুঝেছ রুণু? সৌভাগ্য বললে।

—হ্যাঁ, এসব আমারই কাজ, আমি সমস্ত খরচ করে কত বেশী টাকা বাঁচাতে পারি বলো তো? সৌভাগ্যের দিকে চেয়ে পরম-সৌভাগ্য বললে।

রুণু ভালো করে তাকিয়ে দেখতে লাগলো—সত্যি পরম-সৌভাগ্যের সবই সুন্দর, তাছাড়া কথাবার্তাও চমৎকার। তবে সৌভাগ্যকে তার বেশী ভালো লেগেছে, কারণ প্রথম এসেই সে তার দেখা পেয়েছিল। মন্দভাগ্যটা একটুও ভাল না। কথা বলে যেন মারতে আসছে, বিচ্ছিরি।

—এসো রুণু, ছোট অতিথি, এসো ভাই খেতে বোসো।

রুণু এসে দেখলো চারটে পিঁড়ি পাতা, চার গেলাস জল ঢাকা দেওয়া, সামনেই পরিষ্কার ঝকঝকে থালা-বাটি সাজানো। রুণু বসে পড়লো একটা পিঁড়ির উপর। সামনেই বড় বড় জায়গা করে গরম সব খাবার রাখা রয়েছে, তারই সুগন্ধ ঘরটাকে ভরিয়ে তুলেছে।

—আমি রুণুমণির পাশে বসবো—একথা বলেই পরম-সৌভাগ্য রুণুর ডান দিকে বসে পড়লো।

রুণু সৌভাগ্যের দিকে চেয়ে বললে: তুমি আমার দিকটায় বোসো।

—হ্যাঁ বোসবো, কিন্তু আমি পরিবেশন করবো কিনা, তাই তোমরা আগে বোসো।

—খুব তো কথা বলছো কিন্তু খাবার তো ধরিয়ে ফেলেছো দেখছি, গন্ধ বেরুচ্ছে—খন্‌খনে গলায় মন্দভাগ্য বলে উঠলো!

একটা হাতায় করে গরম ঝোল তুলে সৌভাগ্য বললে—ভাগ্যিস্ বেশী ধরে নি, একটু লাগতেই আমি এসে পড়েছি। খাবার তৈরীর ভার আজ আমার ছিল। তোমার হাতে খেলে আজ আর খেতে হোতো না।

খেতে খেতে পরম-সৌভাগ্য বললে: এ-মাসে কত টাকা ব্যাঙ্কে দিয়েছি জানো ভাই? অনেক অ-নে-ক টাকা।

—এসব ভার তোমার, আমরা জানতে চাই না—সৌভাগ্য উত্তর দিলে।

রুণু অবাক হয়ে একবার তাদের দিকে তাকাচ্ছে আর একবার তাকাচ্ছে গরম ধোঁয়া ওঠা খাবারের দিকে, আর ভাবছে খাওয়া শুরু করবে কি না।

—কি হচ্ছে রুণু?

ময়নাটার তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বরে রুণু তার দিকে তাকালো—তারপর দেখলো কোলের উপর মাথা-ভাঙ্গা পুতুল তেমনি পড়ে আছে। কি রকম হলো?

রুণু চারিদিকে ভালো করে তাকালো, দেখলো সে তার খেলাঘরে বসে আছে। মায়ের ঘরে ভারী পর্দাটা তেমনি ঝুলছে—খেলাঘরের চারিদিকে তার ছেলেমেয়ে, জন্তু-জানোয়ার হাঁড়ি কলসী সবই রয়েছে। সমস্ত ব্যাপারটা ভেবে কিছু ঠিক করতে পারলো না রুণু, তবে তার মাথায় একটা বুদ্ধি জাগলো। এক দৌড়ে নীচে সে তার বাবার অফিস-ঘরে গঁদের শিশির থেকে খানিকটা গঁদ নিয়ে পুতুলের ভাঙ্গা মাথা ঠিক করে নিলো।

—বাঃ, চমৎকার হয়েছে তো? একেবারে নতুন মনে হচ্ছে। মেয়ের গালে একটা চুমু দিয়ে রুণু তাকে কোলে করে উপরে উঠতে লাগলো। ভাল করে তাকিয়ে দেখলো—সিঁড়ি, সিঁড়ির কার্পেট যেখানে যা ছিল সবই আছে। কিন্তু দিনের আলো শেষ হয়ে গেছে, বাড়ীর চারিদিকে আলো জ্বলে উঠেছে। ভাবতে ভাবতে রুণু তার খেলাঘরের সামনে এসে দাঁড়াতেই ময়নাটা বলে উঠলো: কি হচ্ছে রুণু?

একটি মহাজীবন

চম্পানগরের এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ। তাঁর ঘর আলো করে ভূমিষ্ঠ হল এক পরমাসুন্দরী কন্যা—দুধে-আলতায় মেশানো রং, ঘনকালো চুল, সর্বাঙ্গ ঘিরে অসামান্য সৌন্দর্যের সুষমা! গণৎকার পরীক্ষা করে বল্লেন, এ সাধারণ মেয়ে নয়, ভবিষ্যতে এর সন্তান হবে অখণ্ড ভারতরাষ্ট্রের অধীশ্বর। ব্রাহ্মণ সুলক্ষণা মেয়ের দিকে চেয়ে থাকেন আর মনে বুনে চলেন স্বপ্নের জাল।

কিশোরী মেয়েকে নিয়ে ব্রাহ্মণ একদিন হাজির হলেন পাটলিপুত্রের রাজ-দরবারে। তাঁর অনুরোধে রাজা নবাগতার স্থান নির্দেশ করলেন রাজ-অন্তঃপুরে। ব্রাহ্মণ খুশি হয়ে ফিরে গেলেন তাঁর পর্ণকুটীরে। আশঙ্কা আর আনন্দ নিয়ে মেয়েটি প্রবেশ করল রাজ-অন্তঃপুরে। চম্পানগরের দরিদ্র ব্রাহ্মণ গৃহের আলোচ্ছটা এবার উজ্জ্বল করে তুলল মগধ রাজ-অন্তঃপুর। কিছুদিনের মধ্যেই মহাসমারোহে মগধরাজের সঙ্গে বিবাহ হল দরিদ্র ব্রাহ্মণ-দুহিতা সুভদ্রাঙ্গীর।

বছর দু'বছর অতিক্রান্ত হবার পর—রাণীর একটি শিশুপুত্র ভূমিষ্ঠ হল। রাজার জ্যোতিষী গণনা করে বল্লেন, নবজাতক হবে বিশাল ভারতভূমির একচ্ছত্র অধীশ্বর।

রাজা খুশি হলেন; কিন্তু একমাস পর সুভদ্রাঙ্গী যখন শিশুপুত্র কোলে নিয়ে এসে দাঁড়ালেন রাজার সামনে—রাজা চমকে উঠলেন—শিশুর চেহারা দেখে—সুভদ্রাঙ্গীর রূপ কিংবা বর্ণের এতটুকুও ছাপ পড়েনি নবজাতকের দেহে—কুৎসিত, কদর্য তার আকৃতি। জ্যোতিষীর ভবিষ্যৎবাণী শুনে মাত্র কিছুদিন আগে রাজা যে পরিমাণে পুলক বোধ করেছিলেন, আজ তার কদাকার আকৃতি দেখে রাজার মন সেই পরিমাণে বিতৃষ্ণা আর হতাশায় পূর্ণ হয়ে উঠল তবু তাঁরই বংশধর—সুতরাং রাজা নিরুপায়। সুভদ্রাঙ্গীর মনে কিন্তু এতটুকু নিরাশার ছোঁয়া লাগেনি। প্রাণপণ যত্নে বুকে করে তিনি শিশুটিকে লালন-পালন করতে লাগলেন।

ক্রমে শিশু বড় হয়ে উঠল—কৈশোর ছেড়ে অতিক্রান্ত হল যৌবনে—রাজপুত্রোচিত শিক্ষা-দীক্ষা তার সমাপ্ত হল, তবু পিতা মগধরাজ তার প্রতি তেমনি নির্বিকার, উদাসীন। ছেলের দুঃখে দুঃখবোধ করেন সুভদ্রাঙ্গী, তবু রাজার কাছে জানালেন না কোন অভিযোগ।

রাজসভায় একদিন দেখা গেল চাঞ্চল্যের লক্ষণ। খবর এসেছে তক্ষশিলার অধিবাসীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে—রাজার সৈন্যদল বারংবার চেষ্টা করেও সে বিদ্রোহ দমন করতে পারেনি। রাজা পর পর কয়েক দল সামরিক বাহিনী পাঠালেন, কিন্তু বিদ্রোহ দমনে অসমর্থ হয়ে তারা ফিরে এল। প্রধান সেনাপতিরা যখন সাফল্য সম্পর্কে হতাশ হয়ে পড়েছেন, তখন সুভদ্রাঙ্গীর পুত্র সবিনয়ে চাইল রাজার কাছে বিদ্রোহ দমনে অগ্রসর হওয়ার অনুমতি। রাজা মঞ্জুর করলেন তার আবেদন। সুভদ্রাঙ্গীর আশীর্বাদ নিয়ে যুবরাজ বেরিয়ে পড়লেন তক্ষশিলার উদ্দেশ্যে। তাঁর প্রচণ্ড আক্রমণের সম্মুখে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল বিদ্রোহী দল।

বিজয়-গৌরবে ফিরে এলেন যুবরাজ। সুভদ্রাঙ্গী পুত্রের গৌরবে মনে মনে গৌরব বোধ করলেন। রাজা তবু তেমনই নির্বিকার, উদাসীন। পিতৃস্নেহের একমাত্র অধিকারী জ্যেষ্ঠপুত্র সুমন!

কিছুদিন পরে আবার বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠল তক্ষশিলা অঞ্চলে। এবার সৈন্যবাহিনীর পুরোধা হয়ে গেলেন সুমন। কিন্তু বিদ্রোহীদের পরাজয় স্বীকারের কোন লক্ষণই দেখা গেল না।

মগধরাজ তখন জরাগ্রস্ত—বেশীদিন বাঁচবেন বলে আশা করার উপায় ছিল না। তাঁর একমাত্র চিন্তা সুমনকে কি করে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করে

যাবেন। তাঁর আদেশ নিয়ে সংবাদবাহী চলে গেল তক্ষশিলার শিবিরে—সুমন যেন এখনই রাজধানীতে ফিরে আসে—আর তার জায়গায় যুদ্ধ চালাবার দায়িত্ব গ্রহণ করুক সুভদ্রাঙ্গীর পুত্র। এই ছিল রাজকীয় আদেশের মর্ম। কিন্তু মন্ত্রীরা রাজার আদেশ মানতে রাজী হলেন না, মৃত্যুর দ্বারে অপেক্ষমান বৃদ্ধ রাজার আদেশ কার্যকর করে তোলার বিন্দুমাত্রও ইচ্ছা ছিল না তাঁদের। আর তাঁদের পরামর্শ নিয়ে সুভদ্রাঙ্গীর পুত্র রাজার আদেশ অমান্য করে রাজধানীতেই রয়ে গেলেন; সুমন পাটলিপুত্রে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রীদের প্ররোচনায় বন্দী হলেন, আর তাদের মনোনীত সুভদ্রাঙ্গীর পুত্র অভিষিক্ত হলেন যৌবরাজ্যে। কিছুদিনের মধ্যেই বৃদ্ধ রাজা প্রাণত্যাগ করলেন—যুবরাজ রূপান্তরিত হলেন সম্রাটে।

সুভদ্রাঙ্গী খুশি হলেন, বেশীদিন রাজমাতারূপে গৌরব ভোগ করার উপায় রইল না তাঁর। সিংহাসন লাভ করার পর থেকে তিনি লক্ষ্য করলেন, আকৃতির কদর্যতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নূতন রাজার প্রকৃতিও নিষ্ঠুর কদর্যতায় ভরে উঠেছে। হিংসা আর রক্তপাতের নেশায় উন্মত্ত হয়ে তিনি শুরু করেছেন—নরহত্যা, লুণ্ঠন, অত্যাচার। তার অত্যাচারের যূপকাষ্ঠে বলি হলো তাঁর আত্মীয়-পরিজন, মন্ত্রণাদাতার দল। রাজা নিজের হাতে অনুষ্ঠান করে চলেছেন কত হত্যাকাণ্ড—এ দৃশ্য পরম অনুগত সমর্থকদলের কাছেও অসহনীয় বলে মনে হল। শেষ পর্যন্ত তাদের অনুরোধে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত অপরাধীদের চরম শাস্তিদানের জন্য মনোনীত হলো ভয়াবহ নিষ্ঠুরতার প্রতিমূর্তি—চণ্ডাগিরিক! হিংসা আর রক্তপাতে তার অমানুষিক উল্লাস—নিত্য নতুন ধরনের নিষ্ঠুরতা আবিষ্কারে তার অপরিসীম উৎসাহ—সন্ত্রাসবাদের রাজত্ব।

সেদিন নগরে প্রবেশ করলেন সৌম্যদর্শন এক তরুণ তাপস—নাম তাঁর বালপণ্ডিত। নগরের দ্বার অতিক্রম করার সঙ্গে সঙ্গে চণ্ডাগিরিকের ভীমদর্শন অনুচরেরা তাঁকে ধরে নিয়ে গেল। তপস্বীকে কিন্তু একটুও বিচলিত দেখা গেল না। চণ্ডাগিরিকের আদেশে তাঁকে নিক্ষেপ করা হলো কারাগৃহে। সাতদিন পর তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে বলে জানান হলো। নির্দিষ্ট দিনে তপস্বীকে হাত-পা-বাঁধা অবস্থায় নিয়ে তারা এলো বধ্যভূমিতে। আগুনের লেলিহান শিখার উপর রয়েছে তপ্ততৈলের কটাহ। চণ্ডাগিরিকের আদেশে তপস্বীকে নিক্ষেপ করা হলো সেই জলন্ত আগুনের তৈলপূর্ণ কটাহে। চণ্ডাগিরিক নিষ্ঠুরতার আনন্দ উপভোগ করার জন্য তাকিয়ে রইল কটাহের

দিকে—কিন্তু কী আশ্চর্য! কোথায় সেই তপ্ততৈলের পাত্র? তার জায়গায় ফুটে রয়েছে সহস্রদল পদ্ম—আর সেই পদ্মের উপর উপবিষ্ট রয়েছেন ধ্যানগম্ভীর প্রশান্ত সৌম্যমূর্তি।

এই আশ্চর্য ঘটনার কথা শুনে রাজা নিজে ছুটে এলেন দেখতে। তাঁর চোখের সামনেও উদ্ঘাটিত হলো সেই একই অপূর্ব, অকল্পনীয় দৃশ্য। দেখতে দেখতে রূপান্তর ঘটলো রাজাও। নিষ্ঠুরতার শেষ চিহ্নটুকু গেল মিলিয়ে—তাঁর সমস্ত অন্তর পরিপূর্ণ করে দেখা দিল মৈত্রীর পরম প্রসাদ, প্রেমের সঞ্জীবনী স্পর্শ—তপস্বীর পায়ে লুটিয়ে পড়লো রাজার গর্বোন্নত শির—অনুশোচনার আগুনে পুড়ে লাভ করলেন তিনি নতুন জন্ম—কালাশোক রূপান্তরিত হলেন ধর্মাশোক রূপে।*

* অশোকাবদান থেকে

পরীক্ষার পর

কলেজে টেস্ট শেষ হবার পর কি ভয়ঙ্করভাবেই না সুদেষ্ণাকে পড়াশুনায় মন দিতে হয়েছিল। সারাদিন বিরাম নেই বিশ্রাম নেই।

বাবা নাকি মাকে বলে দিয়েছেন---এবার যদি তোমার মেয়ে ফেল করে তাহলে ওকে আর কলেজে যেতে হবে না—একেবারে কলম ছেড়ে এসে তোমার সঙ্গে হাতা বেড়ী ধরতে বলো।

মা-ও তার সঙ্গে সুর মিলিয়ে ছিলেন—তা বৈকি। হ্যাঁ, মেয়েদের অত লেখাপড়ায় আর কাজ কি। সেই তো একই পথ—পরের বাড়ী গিয়ে ঘরের কাজ, নিতান্ত ভালোভাবে ম্যাট্রিকটা পাশ করেছিল আর অত কান্নাকাটি কলেজে পড়বার জন্য তাই না এককাঁড়ি টাকা খরচ করে ভর্তি করা হলো। ঐ ঢের হয়েছে, আই-এ পাশ করলেই ঢের।

ঠাকুরমার কণ্ঠস্বরও শোনা যায়—তোমাদের যেমন ইচ্ছে, সুদেষ্ণার মত বয়সে আমরা রীতিমত গিন্নি-বান্নি। তা যাই হোক মেয়ের বিয়ে-টিয়ের একটা ব্যবস্থা করতে বলো এবার।

ছোট ভাই ললিত সুদেষ্ণার কাছে গিয়ে বললে: শুনলি তো ছোটদি—যদি না পাশ হতে পারিস—অন্য বাড়ী যেতে হবে।

রাগে গা জ্বালা করে উঠে সুদেষ্ণার। সব কথাই তার কানে এসেছে—তবুও ললিতের কথায় মাথার ভিতর কি রকম নাড়া দিয়ে ওঠে—জ্বলে উঠে

বললে, তোর কি? পাশ করতে পারি না-পারি আমি বুঝবো! নিজের পরীক্ষার কথা চিন্তা করগে তো!

স্কুলের গাড়ী এসে হাঁকাহাঁকি করছে—কই সুলেখা বাবা এসো, দেরী হয়ে যাচ্ছে।

সুলেখা 'যাচ্ছি' বলেই দিদির কাছে এসে বলে: দাও না দিদি চুলে রিবনটা বেঁধে—দেরী হয়ে গেছে।

কাঁদতে ইচ্ছা করে সুদেষ্ণার। তবুও দাঁত দিয়ে ঠোঁটটা কামড়ে বোনের প্রসাধন শেষ করে দিলে। তারপর ইংরাজী কবিতার বইটা হাত থেকে ছুঁড়ে দিলে—দরকার নেই পড়ে—। পড়া শেষ হলো না, কেউ একটু সাহায্য করবে না—কেবল আর পড়া হবে না,—এই কথা শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা।

চোখে জল এসে যায় সুদেষ্ণার। কোথায় চলে যায়—ইয়ারো নদীর বর্ণনা। কোথায় হারিয়ে যায় 'এনসিয়েণ্ট মেরিনার'-এর অতি-প্রকৃত সমুদ্র যাত্রার কাহিনী। সুদেষ্ণা ভাবে—কি করি? কিন্তু পড়তে আমার হবেই, আর পাশও করতে হবে।

তাই সুদেষ্ণা পণ করেছে, পাঠ্য-পুস্তক ছাড়া এই দু'মাস সে আর কারো কথা শুনছে না, কোনো দিকে কান দিচ্ছে না। পরিশ্রান্ত হয়ে কোনো মুহূর্তে হয়তো বা টেবিলে মাথা রেখেছে, দু'চোখ ভরে আছে ক্লান্তিময় জড়তা, ঘুমের ভারে শরীর আসছে ভারী হয়ে—তবু সে চেষ্টা করে চলেছে, পাশ তাকে করতে হবেই—অসুখ-বিসুখ না বাধিয়ে ছাড়বে না দেখছি।

আরো একদিন—খেতে বসে উঠে পড়লো সুদেষ্ণা। মা বললেন—কি হলো রে?

—বড্ড গা বমি করছে মা। আর খেতে ভালো লাগছে না।

—কিছু যে খেলি না—অমন করলে কি করে হবে?

এর পরই ঠাকুমার কণ্ঠস্বর: চেহারাখানার কি ছিরি হয়েছে দেখেছ একবার? না খেলে চলবে কি করে? আবার অত পড়া!

মা কাছে এসে তবু বললেন: অসুখ-বিসুখ করেনি তো?

সুদেষ্ণা উত্তর দেয় না—ভাবে অসুখ-বিসুখ—যত বিশ্রাম সব পরীক্ষার পর। অসুখ হোক, যাই হোক;—মরে গেলেও তাকে পাশ করতেই হবে।

মা বলেন: আজ একটু বিশ্রাম নে, শুয়ে থাক—পরে পড়িস।

—বিশ্রাম? আঁত্‌কে উঠে সুদেষ্ণা। বিশ্রাম সব তোলা থাক—তার পরীক্ষার পর সে হাত পা ছড়িয়ে টান হয়ে শুয়ে থাকবে পনেরো দিন অন্ততঃ—তারপর বেড়িয়ে, ঘুমিয়ে আর সিনেমা দেখে তিনটে মাস কাটিয়ে দেবে। এখন বিশ্রামের কথা ভাবাও তার পাপ।

মার কথার জবাব না দিয়েই পড়তে বসে সুদেষ্ণা।

পড়া, পড়া আর পড়া—দুনিয়ার আর কিছু নেই যেন। অসহ্য ক্লান্তিতে যখন সারা দেহমন ভেঙ্গে পড়ে—সুদেষ্ণা ভাবে আর ক'টা দিন, তারপরই অখণ্ড অবসর আর পরিপূর্ণ বিশ্রাম।

গভীর রাত্রে সারা পৃথিবী যখন ঘুমিয়ে পড়েছে—ছোট টেবিলটায় বই-পত্তর ছড়ানো আর টেবিল ল্যাম্প-এর আলোর নীচে সুদেষ্ণা পড়ছে…না, অসহ্য—চোখকে টেনে ধরে রাখা যায় না—কিন্তু বিশ্রাম তো এখন নয়, আর কিছুদিন পরে সুদেষ্ণার পরিপূর্ণ বিশ্রাম—এখন তাকে পড়তেই হবে।

এক গ্লাস জল ঢক ঢক করে খেয়ে নিয়ে, মাথায় ও মুখে দিয়ে আবার সে পড়তে বসলো।

পরীক্ষা শেষ হয়েছে। মন্দ হয়নি মনে হচ্ছে, সুদেষ্ণা তাই আজ শেষ পরীক্ষা ইতিহাসের দ্বিতীয় পত্র লিখে হাল্কা মনে বাড়ি ফিরলো।

ইস্, কী যেন বিরাট স্তূপ নেমে গেছে। শরীর মন তার হাল্কা, উড়ে যেতে পারে যেন সুদেষ্ণা। আজ থেকে সে পরিপূর্ণ বিশ্রাম পাবে—এতদিনের অপরিসীম ক্লান্তি থেকে সুদেষ্ণা মুক্তি পেয়েছে—ভাবলে তার যেন খুশিতে মন ভরে ওঠে।

বাড়ী এসেই কালি কলম আর প্রশ্নপত্র টেবিলের উপর ফেলে দিয়ে—বিছানায় সারাদেহ এলিয়ে শুয়ে পড়লো সুদেষ্ণা।

কিছুক্ষণ পরেই ঠাকুমা এলেন: হয়ে গেল তো আজ? বেশ হয়েছে বাবা বাঁচা গেল, কিছু বলবার উপায় নেই—কেবল পরীক্ষার কথা শুনি। তা যাক—হাত মুখ ধুয়ে ছোট ভাইটিকে একটু ধর, মা জলখাবার করছে—ওটা বড্ড জ্বালাচ্ছে।

—য়্যাঁ বলে কি? সুদেষ্ণা মনে মনে বলে উঠলো। এখন কিছুদিন সে বিছানা ছাড়া চলছে না।

সুলেখাকে বলো গে—বলে সুদেষ্ণা পাশ ফিরে শুলো।

কিন্তু সেদিনটা জেগে, ঘুমিয়ে যা হয় করে কাটলো। পরের দিন থেকে এমন এক আবহাওয়া সৃষ্টি হলো বাড়ীতে যে সুদেষ্ণা ভাবলো: পরীক্ষার আগের অবস্থাটাই তার বুঝি ভাল ছিল।

তরকারী কুটতে কুটতে মা চেঁচিয়ে উঠলেন, ওরে সুদেষ্ণা শীগ্‌গীর বাচ্চাকে ধর, এখনি বঁটিতে হাত পা কেটে রক্তারক্তি করবে।

ছুটে এলো সুদেষ্ণা—কি দুষ্টুই হয়েছে তোমার ছেলে।

ঠাকুমা ডাকলেন: আয় না ভাই এদিকে, আমার একখানা চিঠি লিখে দিবি। আর হরিনামের মালাটা ছিঁড়ে গেছে গেঁথে দিবি।

ওমা, সুদেষ্ণা কোথায় ভাবছে এখনই শুয়ে পড়বে, কিছুক্ষণ শরীরটা তার কেমন যেন লাগছে।

—তা না—। চুপ করে থাকতে দেখে ঠাকুরমা বললেন: পরীক্ষা তো হয়ে গেছে তবে আবার ভাবনা কেন শুনি? আয়, আয়।

অগত্যা যেতেই হয়।

সন্ধ্যার সময় ছাদে বেড়াচ্ছে সুদেষ্ণা, নীচে থাকলেই হাজার ফরমাস। কোথায় তার বিশ্রাম কেউ ভাবেও না একবার সে কথা।

—ওমা দিদি তুমি এখানে? চল চল—নীচে।

সুলেখাকে দেখে বিরক্ত হয়ে জবাব দেয় সুদেষ্ণা।

—জানো না বুঝি—কাল থেকে মাস্টারমশাই দু'মাসের ছুটি নিয়ে গেছেন দেশে মার অসুখ। বাবা বললেন: সুদেষ্ণার পরীক্ষা হয়ে গেছে—এই দু'মাস তুমিই আমায় পড়াবে। চল—চল দিদি, বেশী রাত হলে আমার এমন ঘুম পায়।

বোমার মত ফেটে পড়ে সুদেষ্ণা।—আমি পারবো না, একটুও বিশ্রাম করতে পাবো না কি তোমাদের জ্বালায়?

—তা আমি কি করবো বল বাবা যা বলেছেন তাই বললাম।

অগত্যা!

সকালবেলাই নীচে কি যেন গোলমাল হচ্ছে। খানিকক্ষণ পরে ঠাকুরমার কণ্ঠস্বর শোনা গেল: ওরে সুদেষ্ণা নীচে আয় একবার।

নীচে এসেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল। মায়ের জ্বর হয়েছে, রান্না করার লোক আসেনি—কাজেই ঠাকুরমা বললেন: এবেলাটা তুই চালিয়ে দে ভাই।

রাগে গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সুদেষ্ণা—এখনও চোখ থেকে ভালো করে তার ঘুম ছাড়েনি। অথচ স্কুল আর অফিসে ন'টার মধ্যেই অর্দ্ধেক লোক চলে যাবে।

ঠাকুরমা বললেন: তাতে আর কি, পরীক্ষা তো তোমার হয়ে গেছে।

অগত্যা।

মা ভাল হলেন, রান্নার লোকও এলো, সুদেষ্ণা ভাবলে: যা হোক বাবা এবার তার ছুটি। সুলেখাকে পড়ানোটা কি বিরক্তিকর, মোটেই বুঝতে পারে না কিছু। কিন্তু তবুও দু'টি মাস এখন তাকে এ বোঝা টেনে যেতে হবেই।

বাবার কণ্ঠস্বর পেয়ে সুদেষ্ণা ছুটল তাঁর কাছে!

—আমার বই-এর আলমারীগুলো একটু দেখতে হবে যে মা। মনে হচ্ছে পোকা লেগেছে—ভালো কথা তো নয়, অত দামী বই সব যাবে তাহলে—দু'টো তিনটে দিন হলেই ওগুলো ঝাড়া বা দেখা হয়ে যাবে। কাল থেকে তুমি ওটার ভার নিও তো মা।

সুদেষ্ণা অবাক হয়ে বাবার মুখের দিকে চেয়ে আছে দেখে বাবা বললেন: হ্যাঁ, কাল থেকেই করো তাতে আর কি, তোমার পরীক্ষা তো শেষ হয়ে গেছে।

সুদেষ্ণা আরো অবাক হয়ে বাবার মুখের দিকে তাকালো দেখে বাবা নিশ্চিন্ত হয়ে চলে গেলেন।

—জানো দিদি, বড়দি ছেলে মেয়ে নিয়ে বেড়াতে আসছে, একমাস থাকবে এখানে। বেশ মজা হবে না? পিন্টু নিশ্চয় এতদিনে আরো বড় হয়েছে।

মা এসে বললেন: হ্যাঁ অনেকদিন পরে সুরমা আসবে—একটু জিরোবে, বেচারা শ্বশুর বাড়িতে একটু বিশ্রাম পায় না।

সুদেষ্ণা বললে: দিদির জন্য তো নয়, দিদির ছেলে মেয়ে যা দুষ্টু।

মা বললে: তা আর কি হবে তুমি একটু দেখবে—তোমার তো পরীক্ষা হয়ে গেছে।

সুদেষ্ণা ডাক ছেড়ে কাঁদবে নাকি?

সেদিন সুদেষ্ণা মনে মনে ঠিক করছে কি করে এসবের হাত থেকে পরিত্রাণ পায়। দুনিয়ার সবাই তার বিশ্রামের কথা ভুলে গেছে নাকি?

এমন কি মা-ও? সবার যত কাজ সব স্মুদেষ্ণার জন্য আছে কারণ তার পরীক্ষা হয়ে গেছে—আশ্চর্য।

মা ডাকলেন: মাসীমা এসেছে—ডাকছে সুদেষ্ণা এসো।

মাসীমা অনেক আদর করলেন—তারপর বললেন: কিছু কাজ এনেছি, বেণুর যে বিয়ে—তোকে কতকগুলো ব্লাউজ পেটীকোট সেলাই করে সুতোর কাজ করে দিতে হবে। তোর হাতের কাজ বেণুর ভারী পছন্দ কিনা তাই।

তারপর স্নুদেষ্ণার পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন: বড় লক্ষ্মী মেয়ে। তা যাই হোক তোর তো পরীক্ষা হয়ে গেছে—ভালই এখন অনেক অবসর।

মাসীমার দেওয়া নতুন জামার কাপড়গুলি নিয়ে সুদেষ্ণা ওপরে উঠে এলো। খাটের ওপর সেগুলোকে অবহেলায় ফেলে দিয়ে গুম হয়ে বসে রইল।

ঠাকুরমা যাচ্ছিলেন ঘরের সামনে দিয়ে—ওকে দেখে বললেন: ও সুদেষ্ণা আছিস, আয় না ভাই একটু। তোর বাবার বন্ধুরা আজ খাবে—খাবারের সব ভার আমার ওপর—একটু যোগাড় দিবি—মিষ্টিগুলো ওঠাতে পাচ্ছি না।

অসহায় দৃষ্টিতে সুদেষ্ণা একবার তাকালে ঠাকুমার দিকে। নীচে তখন বাসন-মাজার ঝি চীৎকার করে বলছে: ও মা, ঠাকুর দু'মাস ছুটি নিলো বলে পাঠিয়েছে—ও দেশে যাচ্ছে, ভয়ানক অসুখ ছেলের—টাকা পাঠিয়ে দিও।

সুদেষ্ণা অপেক্ষা করতে লাগলো মা তাকে কখন রান্নাঘরে ডাকবেন।
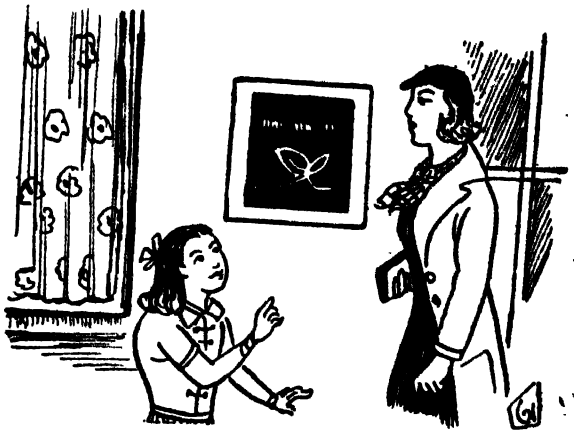
ছ'টা বেজে এক মিনিট

সত্যি ভালো লাগে না, কেবল পড়ো আর পড়ো—না একটু খেলাধুলো না একটু স্ফূর্তি, রেখা বা বেলাদের বাড়িতে বেড়াতে যাওয়া, না সিনেমা দেখা, কেবল পড়ো, ঘাড় গুঁজে, মাথা নীচু করে কেবলই পড়ো। কোনো দিকে তাকিও না, কারুর কথা শুনো না, চোখ কান নাক বন্ধ করে কেবলই পড়ো, ধুত্তোর ছাই এ বাড়িতে আবার লোক থাকে! মনে মনে এসব কথা বলে গরগর ক'রে উঠলো মালা।

সত্যি কথাই, কিছুদিন থেকেই মালার খুব বেশি পড়ার চাপ পড়েছে। বাবা-মা উঠে পড়ে লেগেছেন মেয়েকে একটি বিদূষী তৈরী করবেন— অন্ততঃ মালা তাই ভাবছে সকাল হ'তে তর সয়না, স্কুলে যাবার জন্য রেডি হ'তে হয়, তারপর স্কুল সেরে বাড়ি ফিরতে চারটে বেজে যাবেই। খেয়ে বিশ্রাম করতে না করতেই, বই-পত্তর গুছোতে হবে, আগামীকাল কি কি পড়া আছে তার সব ঠিক করে রেখে ছবি আঁকা বা সেলাই থাকলে তা করে উঠে একটু খেলবার মতলব করার কথা ভাবতেই পড়ার ঘরের দরজায় টোকা পড়লো, আর দরজা খুলতেই মিসেস ডিক-এর সুন্দর চেহারা দেখা গেল আর শোনা গেল : গুড্ আফটারনুন, মালা, আর ইউ রেডি?

মনে মনে গর্জে ওঠে মালা, রেডি না ছাই, এখন সে তো খেলতে যাবে। তা না বসে বসে চিবোনো চিবোনো ইংরেজী শোনো আর পড়ো। মার উপর বেশী রাগ হয় কারন উনিই তো মিসেস ডিককে ঠিক করলেন। মাঝখান থেকে খেলার সময়টুকু গেল।

মিসেস ডিক তো মানুষ খারাপ নন—একটু পড়িয়ে চমৎকার গল্প বলেন—শেষ হলেই বলেন এবার তুমি বলো। গল্প শুনতে বেশ লাগে, তাঁর সময় ভাগ করা আছে, খানিকটা পড়া, খানিকটা গল্প।

আজ কিন্তু মালার একটুও পড়তে ইচ্ছে করছে না, রাগও হচ্ছে, মনে মনে একটা মতলব ঠিক করে নিয়েছে মালা—হ্যাঁ ঠিক আছে, আজকে পড়তে ভালো লাগছে না, যখন তখন···। যথা সময়ে দরজায় টোকা পড়লো। মিসেস ডিক-এর সময় একটুও এদিক-ওদিক হয় না—কিন্তু···ঘড়িটার দিকে একবার তাকালো মালা—তারপর এগিয়ে গিয়ে বল্লে: গুড্ আফটারনুন টিচার।

ঘরে ঢুকে মিসেস ডিক ওর বইতে হাত দিতেই মালা বল্লে: আজ এখন তো পড়া নয়, আপনি যখন আগে এসে পড়েছেন তখন আগে গল্পই হোক।

মালার কথা শুনে ডিক ঘড়ির দিকে তাকালেন, তারপর নিজের হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বল্লেন: ঘড়িটা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বোধহয়, না হ'লে আগে এসে পড়লুম কি করে? একটু লজ্জিত হ'লেন ডিক, তারপর বল্লেন: আচ্ছা, তাহলে গল্প বলি এসো, আজ পড়া থাক।

খুব মজা ক'রে গল্প বলতে পারেন উনি, তাই সময়টুকু ভালো করে কাটলো—পড়ার কথা আজ হ'ল না—তাই মিসেস ডিক চলে যাবার পরে মালা মনে মনে হাসলো। আজ তার মন খুব হাল্কা লাগছে, ছাদে গিয়ে ছুটাছুটি করলো, পুতুলদের উঠিয়ে এনে তার বিছানায় শুইয়ে দিল। দাদার ঘুড়ি লাটাইটা নাড়ানাড়ি করলো। বাঃ, বেশ লাগছে। তার কি রকম বুদ্ধি, একথাও ভাবলো।

কিন্তু সন্ধ্যা হ'লেই তো ওর ঘুম পায়, চোখ ভারী হয়ে নিচের দিকে নামে যেন—তখন যত বকুনী খাক বা আদর পাক—সে বিছানায় গুটিসুটি হয়ে যাবেই! আজও তার কোন ব্যতিক্রম হল না।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছে জানে না, একটা খটখট আওয়াজে সে দেখলো সাদা পোশাক পরা একজন অপরিচিত লোক এসে বলছে: শীগগীর আমার সঙ্গে এসো। মালার একটু ভয় ভয় করছে যেন—কিন্তু কিছু বলবার আগেই তাকে হাত ধরে হিড় হিড় করে টেনে একেবারে নিচে নামিয়ে আনলো, তারপর দরজা খুলে সোজা বাড়ির বাইরে। মালা একবার মৃদু আপত্তি

করলো, কিন্তু কে শুনবে তার কথা। লোকটা যেন আলগোছে তাকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে, কই মালা তো মাটিতে পা'ই দিচ্ছে না। কিন্তু কতদূর তাকে নিয়ে যাবে?

নাঃ, এইবার তাকে ছেড়ে দিয়েছে লোকটা। কিন্তু এ জায়গাটা তো মালা চেনে না, গাছপালা, চারদিকে পাখী ডাকছে—মন্দ লাগছে না—কিন্তু লোকটা গেল কোথায়? যাঃ, কেউ নেই, ওতো একেবারে একলা। আস্তে আস্তে হাঁটতে শুরু করলো মালা। রাস্তাগুলো যেন কেমন কোলকাতার মত মজবুত নয়, ফুটপাতও নেই। ঠাকুরমার মুখে দেশের বাড়ির গল্প শুনেছিল মালা, সেই গল্পের সঙ্গে হুবহু মিলে যায়—ঐ তো টলটলে নীল জলের পুকুর—একদিকে আম আর অন্যদিকে কাঁটাল গাছটির ঝাঁকড়া মাথা দেখা যাচ্ছে। বাঁধানো ঘাট থেকে ভিজে কাপড়ে কে যেন উঠে আসছে। ঠাকুরমা না? এত ছোট কি করে হবে ঠাকুরমা,—মায়ের মত বেশ ছিমছাম সাজগোজ—কপালে লাল ফোঁটা, আলতায় পা দুটো রাঙানো—। ঠাকুরমা তো ওরকম সাজে না, কিন্তু ঠাকুরমা নিশ্চয়—এত সুন্দর আর ছেলেমানুষের মত দেখতে হয়ে গেল কি করে? ঐ তো ঠাকুরমা নিশ্চয়ই। মালার দিকে চেয়ে হাত ইশারায় ওকে ডেকে বড় বাড়িটার মধ্যে ঢুকে গেল যে। ঠিক আছে, দেখা যাক ওই বাড়িতে গিয়ে, ঠাকুরমা কী থিয়েটার করছে? ঠাকুরমাকে এরকম তো কখনও দেখিনি।

ভাবতে ভাবতে মালা ঢুকে পড়লো বাড়িটায়। আরো অবাক হয়ে গেল। নানকুর মত হাফ সার্ট আর হাফ প্যাণ্ট পরে বাবা ডাংগুলি খেলছে আর লাট্টু ঘোরাচ্ছে। ওমা? এ আবার কি? বাবা এত ছোট আর কচি হয়ে গেল কি ক'রে? মালাকে দেখে বাবা চুপি চুপি ওর কাছে এসে বল্লে: তোর চকলেটের বাক্সটা আমি নিয়েছি খুব চমৎকার খেতে, তোকে আমি মার কাছ থেকে বাতাসা এনে দেবো। ওদিকে জ্যেঠুও তো ঘুড়ি লাটাই হাতে চলেছে দেখো! নাঃ! এতো বড় মুস্কিল হল, ঠাকুরমাকে বার করি আগে তারপর সব বোঝা যাবে—ঠাকুরমা, ও ঠাকুরমা—? মালা চীৎকার করতে গেল কিন্তু গলা দিয়ে কোনো আওয়াজ বেরুচ্ছে না—। যাক তবু বাড়ির ভিতর উঠোনে এসে পড়েছে। একদল মেয়ে খেলা করছে, ঐখানেই যাওয়া যাক তাহলে—আরে এ কি! মা, চম্পা-মাসী, ছোট্ট কাকীমা ওরা ফ্রক পরে চোর চোর খেলছে যে! ওরা এত ছোট হয়ে গেল

কি করে? মাথার বড় বড় খোঁপাগুলোও নেই, ঘাড় অবধি কোঁকড়া চুলগুলো বাতাসে দুলছে। চম্পা-মাসী বলছে মাকে, এবার ছাদে চল, অনেক আচার শুকুতে দিয়েছে চিলেকোঠায়, গিয়ে আমরা পুতুলের বিয়ে দেবো আর আচার খাবো।

মা ওদের পিছনে পিছনে সিঁড়ি লাফিয়ে চলে গেল ঠিক যেমন করে মালা যায়। 'এসব কি হ'ল—ও মা!' চীৎকার ক'রে উঠলো মালা।—আবার চেঁচাচ্ছ? চল, আমার সঙ্গে। সেই লোকটা কোথা থেকে উপস্থিত হল।

ভয়ে ভয়ে মালা বলে ওঠে, 'তুমি কে?'

—আমি? আমি হলাম, উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠলো লোকটা, পড়বার ভয়ে যে মেয়ে সময়কে নিয়ে যা ইচ্ছে তাই করে, তার কি শাস্তি হয় জানো? আমি তোমায় শাস্তি দেবো।

—আমি কি করেছি? তোতলামী করে উঠলো মালা ভয়ে ভয়ে।

—আবার মিথ্যে কথা? কি করেছো জানো না—সব নিয়ম উল্টে দিতে চাও? জানো, এখান থেকে ছুঁড়ে তোমাকে যদি ফেলে দিই, ঐ পুকুরের মধ্যে গিয়ে পড়বে। আর এ-রকম করবে তুমি? পড়ার ভয় তোমার খুব, দাঁড়াও সকলকে আমি বলে দেবো। তুমি মূর্খ হয়ে থেকো।

—না, না, বকো না, আমি এরকম করবো না আর—?

তারপর কি হল মালা আর কিছু বুঝতে পারলে না। বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেছে। মালা উঠে বসবে ভাবছে, এমন সময় দরজায় টোকা পড়লো। পরিচিত টোকার শব্দ শুনে মনে সাহস এনে মালা উঠেই দরজা খুলে দিল: সামনে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে মিসেস ডিক—তাঁর সেই মিষ্টি স্বরে ব'লে উঠলেন: গুড্ আফটারনুন মালা। আর ইউ রেডি? হোপ, আই হ্যাভ কাম ইন্ টাইম?

ঢোঁক গিলে জড়ানো জড়ানো স্বরে মালা বল্লে: 'গুড্ আফটারনুন টিচার, ইয়েস ইউ হ্যাভ কাম জাস্ট ইন্ টাইম।' তারপর ঘাড় ঘুরিয়ে দেওয়ালের বড় ঘড়িটার দিকে তাকালো—তখন ছ'টা বেজে এক মিনিট হয়েছে।

মালা সেদিন পড়তে বসেছিল, কিন্তু আগাগোড়া সব কথা মনে হচ্ছিল—তাই ঠিক মত পড়া হল না। তবে তারপর থেকে মালা আর পড়তে ভয় পায় না, বা ঘড়ির দিকেও হাত বাড়ায় না।

পাশের বাড়ির ছেলেটা

অনেক দিন বাড়িটা বন্ধ ছিল। সুস্মি সেদিন দেখল বাড়িটা খোলা হয়েছে আর মিস্ত্রীরা রং চং করে মেরামত করছে। তাহলে এবার এখানে লোকজন আসবে—মনে মনে ভাবলো সে। অনেকদিন থেকে বাড়িটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সে ভেবেছে—যদি ওখানে কেউ বন্ধু-বান্ধব থাকতো, তাহলে কী যে ভালো লাগতো! কিন্তু সে আর হয়নি। তার চেয়ে তিন বছরের বড় দাদা রঞ্জন তাকেও হস্টেলে চলে যেতে হলো—মা বলেন বাবার বদলীর চাকরী বলে তাদের নাকি পড়াশুনোর দুর্গতি হয়। দাদা যতদিন বাড়িতে ছিল—বেশ ভাল লাগতো। দাদার সঙ্গে ঝগড়া হতো না এমন নয়, তবু দাদার সঙ্গে ভাবও কম ছিল না। দাদার কেবল ঐ একটা দোষ, কেবল বলবে—মেয়েদের চেয়ে ছেলেরা সব বিষয়ে বড়। মেয়েরা আসলে যত বড়াই করে তা কিছু নয়। আর এই নিয়েই তো সুস্মির সঙ্গে ঝগড়া বাধে—আরো যখন ছোট ছিল, তখন তো মারামারি বেধে যেতো—শেষকালে সুস্মি বাবার কাছে গিয়ে নালিশ জানাতো আর রঞ্জন বলতো, সেই তো হেরে গেলে আর নালিশ করতে বাবার কাছে ছুটতে হলো—বাবা হচ্ছেন ছেলে—সে কথা কি মনে আছে?

বাবা অবিশ্যি আদর করে ভুলিয়ে দিতেন আর বলতেন, রঞ্জন কিছু জানে না সুস্মি, মেয়েরা কম কিসে? ওসব কথা এখন আর চলবে না। রকেট করে সারা পৃথিবী পরিক্রম করে এসেছে মেয়ে,—মেয়েরা এখন ছেলেদের চেয়ে অনেক এগিয়ে গেছে। আর প্লেন চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন মহিলা পাইলট তোমাদের দূর্বাদি। তাঁর সব কথা তোমাদের কাছে

শুনি—আর কত হিসেব দেবো বল? সব তাতেই এখন মেয়েদের অগ্রগতি—কাজেই মিছে দাদার সঙ্গে ঝগড়া করে লাভ কি?

বাবার কথা সত্যি। কিন্তু দাদা হেরে যাক সেটাও তো স্বপ্নির ভালো লাগে না, তাই মাঝামাঝি রফা হয় প্রায় সময়। কিন্তু দাদা হস্টেলে চলে গেল—এটা একেবারে সইতে পাচ্ছে না সে। 'দাদা তুমি কবে আসবে' একথা প্রত্যেক চিঠিতে লেখে স্বপ্নি…আর গরমের ছুটি, পূজোর ছুটি, বড়দিনের ছুটির জন্য বসে বসে দিন গোনে।

দাদা না থাকার জন্যই তার বড্ড একা লাগে। তাদের বাংলো এমনই যে কাছাকাছি কাউকে পাবার উপায় নেই। বাড়িটার দিকে তাকিয়ে স্বপ্নি মনে মনে কত প্রার্থনা করেছে, তার মত ছোট কেউ যেন আসে ও বাড়িতে। বাড়িটায় মিস্ত্রীর কাজ দেখে আজ স্বপ্নির আনন্দের সীমা নেই।

—আচ্ছা মা, বলো তো ওদের বাড়িতে ক'টা ছেলেমেয়ে আসবে?

—আমি কি করে জানব বল? মা উত্তর দেন।

—বলো না, আন্দাজেই বল; আমার মত একজন আর দাদার মত একজন হলে বেশ হয়—না?

মা হেসে বলেন: বেশ তো তাই আসুক না!

—হ্যাঁ, তাই আসুক। আচ্ছা মা, দাদা কবে আসবে বলো তো? ক'দিন চিঠি আসেনি?

—দাদা আসবে এই পূজোর ছুটিতে—চিঠি তো ও লেখে ঠিক নিয়ম করে। 'বেশী মন-কেমন করছে' একথা দাদাকে যদি বারে-বারে লেখো, তাহলে দাদার একটুও মন টিকবে না ওখানে, পড়াশুনা হবে না—তাই বেশি লিখো না। দাদা এই এলো বলে।

কথা না বাড়িয়ে স্বপ্নি ঐ পাশের বাড়িটার দিকে চেয়ে থাকে আর মনে মনে ভাবে তার মত যেন একটা মেয়ে থাকে, এছাড়াও যদি দাদার মত একটা ছেলে থাকে বেশ হয়।

রোজ সকালে উঠে স্বপ্নি দেখে বাড়িটার কাজ কতদূর এগোলো। মাঝে মাঝে ভাবে বড্ড আস্তে আস্তে কাজ করে লোকগুলো। একদিন তো ডেকেই ফেললে: মিস্ত্রী ও মিস্ত্রী, তোমরা এত ধীরে ধীরে কাজ কর কেন গো?

—কি বলছো খুকী? বুড়ো সর্দার মিস্ত্রী জিজ্ঞাসা করে।

মা ভিতর থেকে বলেন: কি হচ্ছে স্মি? ওরা রাগ করবে না?

তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে স্মি ঢোক গিলে বলে: এই যে বলছিলুম, তোমাদের বুঝি এখনও অনেক কাজ বাকী?

—তা এখনও চলবে। বাড়ীটা অনেক দিন বন্ধ ছিল কিনা।

—এটা কাদের বাড়ী, কতগুলি ছোট ছেলেমেয়ে আছে গো মিস্ত্রী? বুড়ো মিস্ত্রী হেসে বলে: বাড়ী তো চক্রবর্তী বাবুদের, কত ছেলেমেয়ে আছে তা তো জানি না খুকী।

—এই আমার মত আছে একটাও, কিংবা দাদার মত?

—আমি ঠিক বলতে পারবো না খুকী দিদি।

—আমি খুকী দিদি নই, আমি হলাম স্মি।

বুড়ো মিস্ত্রী আবার হেসে বলে: তা হবে।

শেষে একদিন বাড়ীর কাজ শেষ হলো, আর বাড়ীতে অনেক জিনিসপত্র আসতে লাগলো: আরো পরে এলেন বাড়ীর সকলে। স্মি অনেক চেষ্টা করে অনেকক্ষণ জানালায় দাঁড়িয়ে থেকে আবিষ্কার করলো বড়রা অনেকেই আছেন, কিন্তু ছোট একজনকেই সে এখন দেখতে পাচ্ছে। হাফ প্যাণ্ট আর সাদা হাফ সার্ট পরে তার মত একটি ছেলে সিঁড়ি দিয়ে ওঠা নামা করছে। তাহলে মেয়ে একজনও নেই তার মত? মনে মনে বললে স্মি আর ভাবলো, দাদার জিত হবে তাহলে। এই সব ভাবতে ভাবতে পাশের বাড়ীর জানালায় ছেলেটি এসে কখন দাঁড়িয়েছে দেখলো স্মি। ছেলেটি বললে: তোমরা বুঝি এই বাড়ীতে থাকো?

স্মি খুশী হয়ে বললে: হ্যাঁ, তোমরা নতুন এলে? ক'জন ভাই-বোন?

—এই তো আমি, আমার নাম কাজল।

—এসো না আমাদের বাড়ী।

ব্যস আর কি—দু'চার দিনের মধ্যে গলায় গলায় ভাব। স্মি কিন্তু একদিনও নতুন বাড়ীতে যায়নি, দাদা এলে তারপর যাবে। কিন্তু কাজলটা কি সুন্দর কথা বলে, কেমন মিষ্টি স্বভাব, আর কত ভালো—কিন্তু চুলগুলো মেয়েদের মত, তাহলেও বেশ দেখতে।

মাকে সেদিন স্মি বলল, দেখ মা—কাজলের চুলগুলো মেয়ের মত, রাত্তিরে আবার ওর মা রিবন দিয়ে বিনুনী করে দেন—অত চুল কেন মা?

মা উত্তর দিলেন : বোধ হয় মানত আছে, কিন্তু ওর মুখটি কী সুন্দর—একেবারে মেয়ের মত।

ছুটি পড়লো—সুস্মির দিন গোনা শেষ করে রঞ্জন এসে পড়লো বাড়ীতে। খুব হইচই-এর মাঝখানে সুস্মি কাজলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল দাদার—এই ছুটির আগে কাজলদের স্কুলে sports হয়ে গেলো, তাতে কাজল প্রথম হয়েছে অনেক বিষয়ে, আর অনেকগুলি প্রাইজ এনেছে।

রঞ্জন গম্ভীর হয়ে বললে : ছেলেরা হবেই, ও যদি মেয়ে হতো তাহলে হতো না।

—বাজে কথা বলো না—শোনো না আর কিসে কিসে কত কি করেছে, ওর গুণের শেষ নেই!

—ছেলে বলেই হয়েছে।

কাজলের সঙ্গে ভাব হয়েছে বটে, আর তার গুণের কথা অনেক করে বলা হয় দাদার কাছে কিন্তু তবু সুস্মি এখনও একদিনও ওদের বাড়ী যায়নি—কাজল মাঝে মাঝে আসে, না হলে জানালা দিয়ে কথা বলে।

রঞ্জন একদিন বললে : দেখ সুস্মি এবার এসে পর্যন্ত কাজলের গল্পই শুনছি, কত সে ভাল, কত সে বুদ্ধিমান—আর আমি যে বলি ছেলেরা সকলেই এমনি হবে, মেয়েরা হলে হতো না, তা এখন বিশ্বাস হচ্ছে কি?

—তা কেন বিশ্বাস হবে, মেয়েরা কি পারে না পারে তা কি জানো না? তাহলে বাবার কাছে চলো—বাবার লিস্ট আছে জানো?

—বাবা তার মেয়েকে ভোলান।

—কখনও না, বাবা সত্যি কথা বলেন।

মা থামিয়ে দিয়ে বলেন : সুস্মি, উপরে যাও, জানালায় দাঁড়িয়ে কাজল তোমায় ডাকছে, বলেছে একদিনও কেন তুমি যাচ্ছ না ওদের বাড়ী।

সুস্মি মার আঁচল ধরে বললে, কি বলবো মা?

—বলবে বিজয়ার দিন যাবে।

পূজোর ক'দিন খুব আনন্দে আনন্দে কেটেছে, কাজল আবার ছাতে উঠে ঘুড়ি উড়িয়েছে। চমৎকার লাট্টু ঘোরায় কাজল, ওর ঘরে বসে খেলা একটুও ভাল লাগে না। ছোট ছেলেরা যা খেলতে পারে কাজলের একটিও অজানা নেই।

দাদার কেবলই এক কথা; এক সঙ্গে এতগুণ সে কেবল ছেলে বলেই সম্ভব, মেয়ে হলে শুধু পুতুল খেলতো—না হয় বোকা বোকা কথা কইতো।

স্নিগ্ধ খুব রেগে যায়—মাঝে মাঝে ঝগড়াও বাধে। মা বলেন—ছেলে আর মেয়ে নিয়ে কী কাণ্ড তোমাদের, দিনরাত ঝগড়া কর কেন?

রঞ্জন হেসে বলে: মা তুমি কার দিকে?

স্নিগ্ধ চেঁচিয়ে বলে: আমার! আমার দিকে।

মা বলেন: আমি কারুর দিকে নই, নিরপেক্ষ! ছেলেরা অনেক কাজ করে যা মেয়েদের করা সুবিধা হয় না, তাহলেও মেয়েরা অনেক কিছু পারছে, যাতে ছেলেদের লজ্জা হয়—এই তো পরীক্ষার খবর বেরুলে কাদের নাম আজকাল আগে থাকছে? রিসার্চ করছে, ডক্টরেট হচ্ছে, দেশ-বিদেশে চলেছে, কৃতী হয়ে ফিরছে—এসব দেখলে মেয়েদের কৃতিত্ব কম কোথাও—বরং ছেলেদের ছাড়িয়ে যাচ্ছে। তাই ওসব নিয়ে তোমাদের ঝগড়া করা ঠিক নয়।

রঞ্জন হতাশ হয়ে বলে: মা তুমি যে কী বলো, দু'একটা মেয়ে কে কি করলো তাই নিয়ে বল্লে তো চলবে না, সাধারণভাবে বলো?

—আজকাল মেয়েরা ছেলেদের হারিয়ে দিচ্ছে সব তাতে, তা তো দেখছি।

—মা দেখছি খুব খবর রাখো! ছেলেদের কথা বলো না শুনি।

ঠোঁট উল্‌টিয়ে চোখ ঘুরিয়ে স্নিগ্ধ বললে: মা সব খবর রাখে—খবরের কাগজ মার মুখস্থ—জানো মশাই?

উপরের জানালা থেকে কাজল ডাকলো: স্নিগ্ধ, শোন এদিকে।

এক দৌড়ে উপরে গেল, আবার তখনি নীচে নেমে হাঁপাতে হাঁপাতে স্নিগ্ধ বললে: মাগো মা, কাজল গাছে উঠে এই এত্তো—

—গাছে উঠে? মা জিজ্ঞাসা করেন!

—হ্যাঁ, ঐ যে শিউলি আর কৃষ্ণচূড়া—ঐ তো দেখ না—এত ফুল পেড়েছে, আমায় নিতে বলছে।

—কাজল গাছে উঠতে পারে নাকি? হাত-পা ভাঙলে? মা বলেন।

স্নিগ্ধ তাড়াতাড়ি বলে ওঠে: ওমা জানো না, ওর মা বলেন দস্যি মেয়ে!

রঞ্জন বলে ওঠে: ভুল হলো স্নিগ্ধ—দস্যি ছেলে। মেয়ে হলে উঠতে পারতো না।

রাগ করে স্নিগ্ধ বলে: অত জানি না বাবা, ওর মা যা বলেন তাই বলছি। আমি যাই ডাকছে কাজল।

কাজল জানালায় দাঁড়িয়ে বলছে: আমার অনেক কাপড় জামা জুতো হয়েছে পূজোয়—তোমার?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, অনেক হয়েছে আমার—তেরোটা ফ্রক, সুন্দর, সুন্দর—মামার বাড়ী, মাসীর বাড়ী এখানে, বড়দিদু আর রাঙা মামা—আর দিদিভাই মানে আমার দিদিমা একটা শাড়ী দিয়েছেন—কিন্তু আমার একটাও পেটিকোট নেই, ব্লাউজ নেই, তাই ভাবনা হয়েছে।

—আমারও অনেক হয়েছে প্যাণ্ট, সার্ট, ফ্রক, শাড়ী—কাজল মনে করবার চেষ্টা করলো। স্নিগ্ধ হেসে বললে: শাড়ী ফ্রকও পরবে? ছি-ছি—কেমন দেখাবে তোমায়? রাত্তিরে যখন চুল বাঁধো ঠিক মেয়ের মত—

কাজলের মা ডাকলেন—মাস্টারমশাই এসেছেন, কাজল নেমে এস।

—একদিন এসো না আমাদের বাড়ী স্নিগ্ধ? কতদিন আমরা এসেছি, তুমি কেন আসো না? মাকে নিয়ে আজ এসো, কেমন? কাজলের মা বারে বারে বললেন জানালা থেকে মুখ বাড়িয়ে।

রঞ্জন বললে: স্নিগ্ধ বুঝি এতদিনেও যাওনি একবারও? মেয়েদের কাণ্ড কি রকম দেখো! অথচ কাজল কতবার এসেছে। তোমার যাওয়া উচিত তা একবারও ভাবনি।

রঞ্জনেব কথা শেষ হলো না—দেখা গেল কাজল তার মাকে নিয়ে এ বাড়ীতে ঢুকছে। রঞ্জন স্নিগ্ধর দিকে তাকিয়ে বললে: ছেলে বলেই ওর অত বুদ্ধি।

স্নিগ্ধ মাকে ডেকে আনলো—বারান্দায় সাজানো চেয়ারে বসেই সকলে গল্প করতে লাগলেন। কাজলের মা বললেন: কতদিন ভাবছি আসি, কিন্তু নতুন বাড়ীতে এসে গোছাতে গোছাতে সময় হয় না। আপনিও দিদি একবার যান না, তাই ভাবলাম এত ভাব ছোটদের মধ্যে আর আমরা কেউ কাউকে চিনি না এ ভালো না—তাই জোর করে চলে এলাম। কাজলের পড়া শেষ হলো বই নিয়ে উপরে উঠছিল, সবশুদ্ধ টেনে এনেছি।

সত্যিই তো ওর হাতে বই খাতা সব রয়েছে। স্নিগ্ধর মা বললেন: খুব খুশী হলাম ভাই, কালই আমি যাবো, সত্যি আমারই ভুল হয়ে গেছে। বাড়ীটা বেশ হয়েছে আপনার।

কাজলের মা বললেন, আপনার বুঝি এই দুটি ছেলেমেয়ে? এদের কথা কাজল খুব বলে। আমার ভাই এই একটিই মেয়ে—এমন মেয়ে হয়েছে, ছোট থেকে একেবারে ঘোড়ায় চড়া ছেলের মত। আমার মা ওকে ছেলের মতই সাজিয়ে রাখতেন। ওর হাবভাব কাজকর্ম খেলাধূলা সব ছেলের মত দেখেছেন?

বিস্মিত হয়ে সুস্মির মা বললেন: কার কথা বলছেন, কাজলের?

এক মুখ হেসে কাজলের মা উত্তর দিলেন: হ্যাঁ, আমারই মেয়ে—ঐ একমাত্র সন্তান—কাজলের কথাই বলছি। দেখুন না, সব ওর ছেলের মত। সবাই তো ভাবে ঐ প্যাণ্ট-সার্ট পরা দেখে, ও বুঝি আমার ছেলে।

সুস্মি, রঞ্জন ও তাদের মা পরস্পর মুখের দিকে বিস্ময়ের দৃষ্টি নিয়ে তাকালেন। রঞ্জন স্তব্ধ হয়ে গেছে। মা কথা বলার চেষ্টা করতে লাগলেন—সুস্মি কি করবে ভেবে না পেয়ে কাজলের হাতের একটা বই নিয়ে খুলে দেখতে লাগলো—যার প্রথম পৃষ্ঠায় লেখা আছে: 'কুমারী কাজল চক্রবর্তী।'

স্বর্গের গান

আগমনীর আবাহনে
কি সুর উঠিছে বেজে,
দোয়েল শ্যামা ডাক দিল ঐ
বরণেব এয়ো সেজে।

কবিতাটি তোমরা পড়েছ আর—

দোয়েল, শ্যামার মিষ্টি গানও হয়তো তোমরা শুনেছ। কত পাখী কত চমৎকার দেখতে আর তাদের কণ্ঠস্বরের মিষ্টি গানও কত চমৎকার। সব পাখীই যে মিষ্টি ডাক দেয় বা গান করে তা নয়—তবে অনেক পাখীর ডাকই মিষ্টি লাগে। তোমরা যারা শহরে থাক তারা হয়তো পাখীর গান শুনতেই পাও না—কদাচিৎ বসন্তকালে ইট-কাঠ-ঘেরা পাঁচিলের আড়ালে কোনো ঝাঁকড়া-মাথা গাছের ভিতর থেকে 'কুহু' করে ডেকে ওঠা কোকিলের একটু আওয়াজ পাও। কিন্তু যারা শহরের বাইরে আছ তাদের নানা ধরণের গাছপালা বা নানা জাতীয় পাখী দেখবার সুযোগ হয়। কিন্তু শহরে থাকলেও অনেক পাখীর নাম চেনো বা কাউকে দেখবার সুযোগও হয়ে যায়। চিড়িয়াখানা ছাড়াই বলছি। দেশী বিদেশী কত রকম পাখীই তো দেখা যায় আবার যাদের দেখিনি তাদের গল্পও শোনা যায়—ছবিও দেখা

যায়—আচ্ছা বিদেশী পাখী পেলিকানের কথা ভাবো, মনে হয় না কি কেমন আঁট সাঁট জামা পরে ফিটফাট বাবুসাহেব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে? এমনি দেশী পাখীও কত রকম আছে, কাকাতুয়ার হলদে ঝুঁটি থেকে, রাঙা ঠোঁট টিয়ার কথা ছেড়ে দিয়ে, বহু চমৎকার পাখী আছে, যার কথা শুনে কান জুড়োয়—তাই নয় দেখলে, নয়নও জুড়োয়।

কি বলছিলাম বলো তো? হ্যাঁ গল্প, এবার গল্পই বলবো তোমাদের। সুকণ্ঠী দোয়েল পাখীর কথাই বলি—কি বল?

একটা বিরাট ঝাঁকড়া মাথা গাছ—অসংখ্য তার শাখা-প্রশাখা। পাতায় পাতায় ভর্তি—এত ডালপালা আর এত পাতা যে ভিতরটা খুব ভালো করে দেখা যায় না। এই গাছটায় সব পাখীদের সভা হয়। প্রতিদিনই একটা নির্দিষ্ট সময়ে সব পাখীরা এসে জড় হয় আর সভাপতি ঈগল পাখী এই সভায় সভাপতিত্ব করে। শুধু তাই নয় সকলের অভিযোগ শোনা, তার ব্যবস্থা—সুখ দুঃখ, সব বিবাদের মীমাংসা করা কিছুই বাদ যায় না।

এই রকম একদিনের সভায় সঙ্গীত সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছিল। উপস্থিত পাখীদের মধ্যে অথবা যারা অনুপস্থিত ছিল—তাদের মধ্যে কার কণ্ঠস্বর ও সঙ্গীত সবচেয়ে ভালো এই হলো আলোচনার বিষয়বস্তু।

অনেকে অনেক রকম মত প্রকাশ করলে। একদল আর একদলের রূপের প্রশংসাই করলে আসলে সঙ্গীতের কিছু জানে না। অপর দলের মতে কেউ কেউ সঙ্গীতের জন্য খ্যাতি অর্জন করেছে এ রকম কথাও শোনা গেল।

শালিখ বলে: বলো না ভাই তোমাদের সঙ্গীতের কথা, পৃথিবীর মানুষগুলো কোকিলের কুহু রব শুনেই মুগ্ধ হয়ে যায়, বউ কথা কও, পাপিয়া এরা কীই বা কথা বলে, ঐ শুনে তাঁরা 'আহা কী সুন্দর', বলে অস্থির হয়।

—মানুষদের কথা ছেড়ে দাও, ওরা বাড়ীতে খাঁচায় পাখী পোষে আর নিজেদের বলা ভাষা তাদের শেখাতে চায়। বেশি দিন শুনে শুনে আমরা সেই কথাগুলোই বলতে অভ্যস্ত হয়ে যাই—আর ওরা বলে: পাখীটা কি সুন্দর কথা বলছে। আসল কষ্টটাই ওরা বোঝে না আমাদের। খাঁচায় বন্দী করে কথা শুনতে চায়—লাল ঠোঁট ঘুরিয়ে টিয়া বলে উঠলো।

—মানুষেরা যা ভালোবাসে বাসুক—কিন্তু যাকে বলে আসল সঙ্গীত তা শিখতে হলে পৃথিবীর মানুষ কেন—পাখী জাতও পারবে না—বুলবুলি বলে উঠলো।

—তুমি কি বলছো ঠিক বুঝতে পাচ্ছি না যে—কাকাতুয়া কর্কশ কণ্ঠে বললে।

—আজ যা বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা হচ্ছে তাতে তোমার কণ্ঠস্বর নিতান্তই বেমানান লাগছে—ময়না বললে।

—কিন্তু ময়নামাসী, কাকাতুয়া দাদার কণ্ঠস্বর একটু তীক্ষ্ণ হতে পারে; কিন্তু মানুষদের মত সব কথাই বলতে পারে জানো ?

—তুমি থামো তো চন্দনা, কথা বলা আর সঙ্গীত দুটো এক জিনিস নয়—একথা ভুলে যেও না।

এবার সভাপতি ঈগল পাখা দুটো একটু ফুলিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বলে উঠলো : আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু কিন্তু বদলে যাচ্ছে। আমাদের পাখী সমাজে যা কিছু গান জানে তা মোটামুটি শ্রুতিমধুর হলেও, আসল সঙ্গীতের জন্য সাধনা দরকার, শিক্ষা দরকার।

কাঠঠোকরা বলে উঠলো : ঠিক, ঠিক, ঠিক—সব কিছুরই সাধনা চাই, ফাঁকি দিয়ে কোন মহৎ কাজ হয় না। তাছাড়া তোমরা তো সব আধুনিক গান করো—ফুল, চাঁদের আলো, আকাশ, বাতাস হলো তোমাদের গানের কথা—কিন্তু সত্যিকারের যে সঙ্গীত সে ক'টা পাখী গাইতে পারে ?

—সেইজন্য বলছি শিক্ষা দরকার, সাধনা দরকার।

ঈগলের গম্ভীর কণ্ঠ শুনে আলোচনা কিছুক্ষণের জন্য থেমে গেল। এবার ময়নামাসী বলে উঠলো : আপনি ঠিকই বলেছেন—কিন্তু যে সঙ্গীতের কথা আপনি বলছেন—তা শিক্ষা করতে গেলে কি করতে হবে ?

—করতে অনেক কিছুই হবে—এখানে বসে কিছুই হবে না—শালিখ বললে।

—ছোট্ট ফিঙ্গে বলে উঠলো : এখানে যদি না হয়—কোথায় যেতে হবে ?

—স্বর্গে !

—হ্যাঁ স্বর্গে, আমি যে সঙ্গীতের কথা বলছি তা মর্তে কেউ শোনাতে পারবে না, জানেও না—তাই যদি সেই সঙ্গীত আয়ত্ব করতে হয় তা হলে কাউকে স্বর্গে পাঠাতে হবে।

ঈগলের মুখ থেকে একথা বার হওয়ামাত্র পাখীর দলের মধ্যে মৃদু গুঞ্জন উঠলো—সকলেই সকলের দিকে তাকিয়ে দেখলো, সকলের চোখে মুখে একই প্রশ্ন—কে যাবে, কে যাবে।

সত্যিই তো কে যাবে ?

ভরসা করে এগিয়ে এলো ছোট্ট টুনটুনি—মাথা নত করে ঈগলকে বললে : আমাদের এই পাখীরাজ্যের আপনিই প্রধান, আপনি যদি স্বর্গে গিয়ে সেই অপূর্ব সঙ্গীত শিক্ষা করে আসেন—তবেই সব দিক থেকে শোভন হয়।

এতক্ষণ যারা সেই কথাই বলবে ভাবছিল—তারাও সমবেতভাবে বলে উঠলো : টুনটুনির কথায় আমরাও একমত হচ্ছি। আপনারই যাওয়া উচিত।

—আচ্ছা ভেবে দেখি, কালকের সভায় এই প্রস্তাবের উত্তর দেবো।

সেদিনের মত সভা শেষ হলো। ঝাঁকড়া-মাথা গাছটা থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে বিভিন্ন রকমের পাখী উড়ে উড়ে নীল আকাশের গায়ে মিলিয়ে গেল।

ঈগলের আজ যাত্রার দিন।

দলে দলে পাখীরা এসে জড় হয়েছে সেই ঝাঁকড়া-মাথা গাছটার কাছে। আজ কেউ আর গাছের ডালে বসে সভা জমাচ্ছে না, সভাপতির স্থানটাও খালি। আজ তারা সকলেই দল বেঁধে বিদায় অভিনন্দন জানাতে এসেছে ঈগলপাখীকে—তার 'যাত্রা শুভ হোক' এই ধ্বনির সঙ্গে। যথাসময়ে সকলের শুভেচ্ছা নিয়ে ঈগল আকাশে উড়লো—প্রথমে মন্দগতি, তারপর দ্রুতগতি হতে লাগলো—সব পাখীরা আকাশের দিকে চোখ তুলে—যতক্ষণ দেখা গেল দেখতে লাগল—তারপর ক্রমশঃ বিন্দুর মত হতে হতে ঈগল মিলিয়ে গেল।

এবার বাসায় ফেরার পালা। টুনটুনি বললে : আচ্ছা, সকলকেই দেখলাম, দোয়েল কোথায় গেল—সভাপতির বিদায় সম্বর্ধনায় কিম্বা যাত্রাকালে তাকে তো দেখতে পেলাম না।

সত্যি দোয়েলকে কেউ দেখেনি। তার সম্পর্কে অস্ফুট গুঞ্জন হতে লাগলো, কে জানে, গেল কোথায়, আজ তো তার উপস্থিত থাকা উচিত ছিল।

কিন্তু তাকে দেখতে পাওয়া গেল না—কথা বলতে বলতে সকলেই ফিরে এসে ঝাঁকড়া-মাথা গাছটার নীচে অপেক্ষা করতে লাগলো—ঈগলের ফিরে আসা পর্যন্ত। ঈগল উড়ছে তো উড়ছেই!

ধীরে ধীরে উড়তে আরম্ভ করে গতি দ্রুতি হয়ে এলো। মনের মধ্যে কত আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে সে উড়ছে, মাঝে মাঝে পৃথিবীর কথাও মনে পড়ছে।

উড়তে উড়তে অনেক উঁচুতে উঠে গেছে—এতক্ষণ ভালই লাগছিল—কিন্তু এবার যেন গরম লাগছে, বেশ গরম—সূর্যের তেজই এই তাপমাত্রা বাড়িয়ে তুলছে। আরো কিছুক্ষণ এই তাপের মধ্যে দিয়েই ঈগল উঠতে লাগলো, কিন্তু আর পারা যাচ্ছে না, পাখাগুলো জ্বালা করছে, কণ্ঠতালু শুকনো হয়ে এসেছে—মনে হচ্ছে একটু পরেই তার ঝলসে যাওয়া দেহ স্থির হয়ে যাবে। এতদূর এসেও তাহলে তার সব নষ্ট হয়ে যাবে। অনেক অনেক দূর সে এসেছে আর একটুখানি মাত্র। কিন্তু একেবারে সূর্যের কাছাকাছি এসে পড়েছে যে, আর একটুখানির কথা সে ভাবতে পারছে না। উঃ আর পারা গেল না।

সত্যিই আর পারলো না ঈগল—নীচের দিকে নামতে সুরু করলো, পুরোপুরি নীচে নেমে সেই গাছের নীচে আসতে পারবে এ আশা তার হচ্ছে না—কিন্তু যদি সে আসতেই পারে তবে যারা তার জন্য অপেক্ষা করে আছে সেই পাখী-গোষ্ঠীকে কি বলবে সে? পাখী-গোষ্ঠীর রাজার শেষে এই পরিণাম হলো? মনে মনে লজ্জা বোধ করলেও ঈগলের মনে হচ্ছিল মাটিতে নামবার আগেই সে জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়বে—তার গতি মন্দ হয়ে এসেছে, ঝলসে যাওয়া পাখা আর ভর সইছে না।

ঠিক সেই সময় তার কাঁধের কাছে ভারী মোটা পালকের ভিতর থেকে ছোট্ট একটা কি যেন ফুরুৎ করে উড়ে গেল। ঈগলের তখন কিছুই বোধগম্য হচ্ছিল না। আপনাআপনি তার দেহ নীচের দিকে নেমে আসছিল।

ঈগলের কাঁধের কাছ থেকে বেরিয়ে গেল দোয়েল। সে উড়তে উড়তে একেবারে শূন্যে মিলিয়ে গেল। তার মনে হলো ঈগলের যাত্রা যখন ব্যর্থ হলো তখন এবার তার প্রতিদ্বন্দ্বী আর কেউ রইল না, স্বর্গের অপূর্ব সঙ্গীত শিখে সে সমস্ত পৃথিবীকে সেই গান শোনাতে পারবে। পরম আশ্চর্যে সারা পৃথিবী সেই গান শুনবে আর তার প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠবে। আর কোনও পাখীর এই গান শোনাবার দক্ষতা থাকবেও না—আমিই একমাত্র শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করবো।...ভাবতে ভাবতে দোয়েল স্বর্গের সেই স্থানে উপস্থিত হলো।

ঈগল এসে পৌঁছুলো। দেহে তার আর কোনো শক্তি সামর্থ্য নেই, মুখ দিয়ে কোনো আওয়াজ বেরুচ্ছে না। আকাশের দিকে তাকিয়ে বড় গাছের নীচে যে সব পাখীরা অপেক্ষা করছিল—তারা চারিদিক ঘিরে এল। তারা খুশী মনে প্রস্তুত হচ্ছিল রাজা এসে তাদের গান শোনাবে—সেই গান তারা শিখে সারা জগৎকে শোনাবে—কিন্তু একি হলো? ঈগলের অবস্থা যা তাতে

সে বেঁচে উঠবে বলে ভরসা নেই। কিন্তু কোনো খবরই তো সংগ্রহ করা সম্ভব হলো না। সকলে মিলে যথারীতি সেবা আরম্ভ করে দিলে—পাখীদের কবিরাজ এসে পরীক্ষা করলো। সকলেই উদ্বিগ্নভাবে অপেক্ষা করতে লাগলো ঈগলের কি হয়। কেন এরকম হলো—অনেক দূর অগ্রসর হতে দেখেছে তারা ঈগলকে। পাখীরাজ্যের এমন শক্তিধরকে পাঠানো হলো আর সে অকৃতকার্য হয়ে ফিরে এলো—এ কি রকম কথা? ঈগল সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত কিছুই জানা যাচ্ছে না।

স্বর্গের অপূর্ব সঙ্গীত আয়ত্ত করে দোয়েল ফিরে এসেছে। পৃথিবীতে নামবার পথে দোয়েল কত কথাই ভাবছিল। কোনো পাখী এ পর্যন্ত এমন মধুর সঙ্গীত শোনাতে পারেনি, সেই সঙ্গীতের অধিকারী হয়ে সে ফিরেছে শুধু পাখী সমাজেই নয়—মানুষেরাও তার গান শুনে বিস্মিত হয়ে বলবে—এমন গান আর কোনো পাখীর কণ্ঠে শোনা যায়নি—সে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করবে···ভাবতে ভাবতে দোয়েলের মন আনন্দে অহঙ্কারে ভরে উঠেছিল। ঈগল ব্যর্থতা লাভ করলেও সে সার্থক হয়েছে—জয়ী হয়েছে। দোয়েল এসে ঈগলের অবস্থা দেখলো, একমাত্র সেই জানে, ঈগল কত কষ্টে, কতদূর উড়ে গিয়েছিল, কত চেষ্টা করেছিল সে আর কিছুটা অগ্রসর হবার—সূর্যের কাছাকাছি এসেও তার চেষ্টা চলেছিল, ভেবেছিল আর একটু যদি এগিয়ে যেতে পারি—কি অসহ্য তাপ, সে তাপে তার সর্বাঙ্গ পুড়ে যাবার মত হলেও চেষ্টা করেছে, তারপর যখন সত্যি ঝলসে গেল পাখা, আর যখন কোনো ক্ষমতা রইল না তখন কি অবস্থায় তাকে নামতে হয়েছে তা একমাত্র দোয়েলই জানে। যাবার পথে তাকে কোনো কষ্ট করতে হয়নি, খুব আরামে, অনেক স্বচ্ছন্দে চলে গেছে—কিন্তু যে কষ্ট করে মৃতপ্রায় হয়ে আছে, বেঁচে ওঠার ভরসা যার নেই সে বিফল হয়েছে। দোয়েল অনেকক্ষণ ধরে সব দেখলো—অনেকক্ষণ চিন্তা করলো, সে যা পেয়েছে তা অনায়াসলব্ধ, এর জন্য তাকে কোনো ক্ষতি স্বীকার করতে হয়নি, কোনো পরিশ্রম করতে হয়নি অথচ সে পেয়েছে।

ভাবতে ভাবতে তার নিজের মনে ধিক্কার এলো। এতক্ষণ সে মনে করেছিল গান শুনিয়ে সে বাহবা নেবে। পাখী আর মানুষ ধন্য ধন্য করবে আর সে গর্ব অনুভব করবে—কিন্তু কি করেছে সে—এর জন্য যদি কিছু প্রাপ্য থাকে তা হলো ঈগলের। নিজের প্রতি ঘৃণা হলো তার। অনেকক্ষণ ঈগলের অশক্ত দেহের কাছে বসে বসে ভাবলো, দু'চার ফোঁটা চোখের জল ফেললো—

তারপর মনে হলো, না সে আর থাকবে না, মানুষ বা পাখী তাকে দেখতে পায় এমন স্থানেই সে আর থাকবে না। যে সঙ্গীতের অধিকারী সে হয়েছে তা সকলকে শুনিয়ে আর বাহাদুরী নেওয়া হলো না, মনের গতি বদলে গেছে। তাই কয়েকদিন পরে যখন ঈগল সুস্থ হয়ে উঠবে এমন আশা দেখা গেল—দোয়েল তখন মনে মনে ভগবানকে ধন্যবাদ জানিয়ে সেখান থেকে নিঃশব্দে চলে গেল। নীল আকাশের মাঝে পাখা দু'খানা ছড়িয়ে দিয়ে উড়তে উড়তে কখন কোথায় মিলিয়ে গেল। দোয়েলকে আর কেউ দেখতে পেলো না।

মানুষের কাছ থেকে পাখীদের কাছ থেকে দোয়েল অনেক দূরেই থাকতে চাইলো তাই উড়তে উড়তে সে মিলিয়ে গেল।

দোয়েলের এই আত্মগ্লানিই তার মনের সব অহঙ্কার নষ্ট করে দিলো, ভগবানের আশীর্বাদ লাভ করলো—এতবড় সুকণ্ঠের অধিকারী খুব কম পাখীই দেখা যায়। কিন্তু তোমরা সচরাচর দোয়েলকে দেখতে পাবে না, সঙ্গী সাথী ছেড়ে একলাই ঘুরে বেড়ায় আর ভগবানের দানে যে সুকণ্ঠ পেয়েছে—সেই কণ্ঠে অপূর্ব সঙ্গীত গায়। মনে হয় কোনো সাধু সন্ত ভজন করছেন। আসল প্রাণীটিকে সচরাচর দেখা যায় না, তবে তার গান শোনা যায়। আমরা তার গান শুনে খুশী হ'য়ে দেখবার চেষ্টা করি—কিন্তু ওরা যেই সে কথা বুঝতে পারে উড়ে চলে যায়, একা একা থাকতে ভালবাসে। বিদেশীদের চোখে ওরা সত্যিই সাধু সন্ন্যাসী।

কবিতা

খুড়োমশাই

সে ভাই মহা মজার ব্যাপার
জড়িয়ে গায়ে গরম র‍্যাপার
খুড়োমশাই ঘুমিয়েছিলেন
আপনি শোবার ঘরে।
হঠাৎ খুড়ো চমকে উঠে
মাটির পরে পড়লো লুটে
ডাক ছেড়ে ভাই উঠলো কেঁদে
শব্দ পাড়া ভরে !
দুপুর রাতে হঠাৎ ওকি—
খুড়োর মাথা বিগড়ালো কি—
কান্না শুনে চমকে এলো
পাড়ার ছেলে বুড়ো।
নরুর কাকা বললে কেশে
একটুখানি মুচকে হেসে—
'দুপুর রাতে কান্না কেন
ব্যাপারটা কি খুড়ো ?'
'ওরে বাবা একি হলো
এঁ্যা ওরে এঁ্যা কোথায় গেল ?'
বিকট রকম স্বরে খুড়ো
রোদন পিলু ভাঁজে।
কামড়ালো কি গোখরা সাপে ?
খুন হলো কি খুড়োর বাপে ?
হরেক রকম প্রশ্ন জাগে
সবার মনের মাঝে।

খুড়ো তখন ফুঁপিয়ে কেঁদে
কাঁদার নানান ছন্দ ফেঁদে
বললে—আমার বুক ফেটে যায়
ওরে ও বাবারে—
ঘুমিয়েছিলাম আপন মনে
স্বপ্ন সুখে অচেতনে
জেগে উঠে পাচ্ছি না আর
আমার র‍্যাপারটারে।
সব দেখেছি এধার ওধার
বাক্স ডেস্ক আল্‌মারি আর—
খাটের তলায় চার পাঁচবার
এলাম খুঁজে খুঁজে।
বালিশ গদী তোষকগুলো
ঝেড়ে বাহির করনু তুলো
জিনিষ আর পত্তরেতে
ঘর গিয়েছে বুঁজে।
পাইনি তবু আমার র‍্যাপার
ভাব একি বিষম ব্যাপার
কোথায় গেলো কী যে হলো
তোমরা বলে দাও।
র‍্যাপার বিনা কেমন করে
বেড়াতে হায় যাবো ভোরে
কি ভয়ানক কথা এ যে
তোমরা বুঝে নাও।'

হঠাৎ পুটু কয় চেঁচায়ে—
'ঐ তো র‍্যাপার খুড়োর গায়ে
মিথ্যেমিথ্যি এমন করে
বাধালে হুল্লোড়।
জাগিয়ে দিলে নিশুত রাতে
যত যারা রয় পাড়াতে,
ঘুরিয়ে দিয়ে একেবারে
কাঁচা ঘুমের মোড়।'

সবাই তখন চায় চ্যাঁচায়ে
ঠিক তো র‍্যাপার খুড়োর গায়ে
ঘুম চোখে সব ছিলাম বলে
পাইনি ভালো টের।
পুটুর কথা সত্যি খাঁটি
চাঁদা করে লাগাও চাঁটি
খুড়োর মাথার পোকাগুলো
দাও করে সব বের।

পুতুল পুতুল

তুল তুল তুল
তুলোর পুতুল
পুতুল কোথায় যাবে
তুল তুল তুল

পুরী কি পান্জাবে ?
টুক টুক টুক
টুক টুকে ঐ
লাল শাড়ীটা পরে

চুক চুক চুক
চুমুক চুমুক দুধ খেয়ে নে ওরে–
ঝুম ঝুম ঝুম
ঝুমুর ঝুমুর

ঘুমুর বাজে পায়
তুল তুল তুল
খুকুর পুতুল
শ্বশুর বাড়ী যায়॥

খোঁড়া

পথের মাঝে ভিড় হয়েছে দেখে
আমি নিজে আপনা থেকে
দাঁড়িয়ে গেলাম পথের মাঝে—
দুইটি কালো লোককে ঘিরে
আসছে বা কেউ যাচ্ছে ফিরে।
ভিড় করে ভাই—দাঁড়িয়ে আছে কেউ বা বিনা কাজে।

প্রথম যে জন, বললে হেঁকে তারে
'সারাদিনই টানছি বারে বারে
গাড়ীতে বসে ভিক্ষা চাওয়া মস্ত বড় কাজ!'
দ্বিতীয় জন বললে ডেকে প্রথমে
'খুব হয়েছে যাও না বাপু থেমে
ভিক্ষা চাওয়ার কেরামতি অনেক হে রাজাধিরাজ।'

দেখনু চেয়ে ভাল করে
বললে ডেকে এ উহারে
'আচ্ছা করে করলে মজা, সকাল থেকে চড়লে শুধু গাড়ী
আমি ব্যাটা মরছি টেনে
এখান থেকে ওখান এনে
রাস্তা কত শেষ করে হায় ফিরনু বাড়ী বাড়ী।'

একটা কাঠের গাড়ীর মাঝে
কদর্য এক মূর্তি রাজে
সারা অঙ্গে পট্টি বাঁধা, খোঁড়া এমন সাজ।
যে জন তারে চলছে টেনে
বলছে: সবই নিচ্ছি মেনে,
আমার বেলা কেবল ফাঁকি! রইল তোমার কাজ

ঝগড়া খানিক করার শেষে
পট্টি বাঁধা বললে হেসে
'রাগ করো না দোহাই তোমার দাদা'।
একে একে খুললে পট্টি
হাতে পায়ের যত ফেট্টি
ব্যাপার দেখে আমি তো ভাই
বনে গেলাম গাধা।

খোঁড়া যে জন সহজ হলো
সহজ মানুষ ভোল ফেরালো
খোঁড়া হয়েই রইল বসে কাঠের গাড়ীতে
খোঁড়া মানুষ সহজ হয়ে
চললো টেনে তাকে লয়ে
ক্রমে ক্রমে মিলিয়ে গেল দূরের পথেতে।

ব্যাপার দেখে অবাক মানি
কেমন করে নাইক জানি
খোঁড়ার আবার ঠ্যাং গজালো নাকি!
দেখে শুনে অবাক হয়ে
নীরব হয়ে রইনু চেয়ে
হে ভগবান! দেখার কত বাকি?